
পথে পথে
চঞ্চলিয়া

পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

PATRE PATRE CHANCHALIA

by

Dr. BISWANATH ROY

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজস্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট
এঁকেছেন
দিলীপ দাস

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ভট্টাচার্য
ও
কল্যাণীয়
শ্রীমান দীপ্ত ভট্টাচার্যকে

॥ এক ॥

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন

যেদিন ধরণী ব্যথাহীন ছিল, সত্যি কথা বলতে এ-কাহিনীর শুরু সেদিন থেকেই। সেদিনের ইতিহাস ভূগোল অনেক বদলে গেছে। ভাষাও বদলে গেছে। তবু বোধহয় আসল রূপটা বদলায় নি। মানুষের হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, আশা-হতাশার রূপ বদলায় নি।

সে-দিনের ভূগোল আজকের মত ছিল না। সে-যুগের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ বলে কোন রাজ্যের নাম শোনে নি। এ দেশ তখন ভারী আশ্চর্য ছিল। ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, রূপনারায়ণের এক আশ্চর্য আকর্ষণ, আশ্চর্য সমন্বয়, আশ্চর্য ভালবাসা। ভাগীরথীর উত্তরে গৌড়, পদ্মার দু'পাশে গড়ে উঠেছিল সমতটভূমি, ভাগীরথীর দক্ষিণে কর্ণসুবর্ণ আর রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্ত। মধ্যে সরস্বতীর তীরে আদিসপ্তগ্রাম আর বর্ধমান।

তারপর ইতিহাস বদলে গেল, ভূগোল বদলে গেল এ-দেশের। সমতটভূমি থেকে একদিন জ্ঞানের আকর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বেরিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে অসাধারণ জ্ঞানের আলো বিকীরণের জন্য। সেদিন মুক্তির আলোক প্রত্যক্ষ করার প্রত্যাশায় মানুষ শ্রদ্ধাভরে তাকিয়েছিল বঙ্গভূমির মনীষী-সন্তান দীপঙ্করের দিকে।

কোথা থেকে এ-কাহিনী শুরু করব বুঝতে পারছি না। গৌড় রাজ্য বিলীন হয়ে গেল, মুসলমান রাজত্ব গড়ে উঠেছিল বঙ্গদেশের বুকে। ঢাকা শহর হয়েছে বঙ্গদেশের রাজধানী। কোন সময়ে মুর্শিদাবাদ, কোন সময়ে ঢাকা রাজধানী হয়েছে বঙ্গদেশের। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে পাশাপাশি গ্রামে, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেছে। কোন সময়ে ঝগড়াঝাঁটি

করেছে, কোন সময়ে পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছে, কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে যায় নি, ছেড়ে যাবার কল্পনা করতে পারে নি। একজন মূর্খ মুসলমান দর্জিকে বলতে শুনেছি, হিন্দু-মুসলমান হচ্ছে বাঙালী জাতির ডান হাত বাম হাত। একটা হাত কেটে ফেললে কি কোন মানুষ বাঁচতে পারে, না কাজ করতে পারে? বাঁচতে গেলে দুটো হাতই চাই। বাঙালীকে বাঁচতে হলে তেমনি হিন্দু-মুসলমানকে, একসঙ্গে বাস করতে হবে। আর ইংরেজরা কী জানো? ইংরেজরা হল গায়ের ময়লা। চিটে ময়লা। সাবান মেখে চান কর, দেখবে গায়ের সব ময়লা ধুয়ে গেছে। গা পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে গেছে। তোমরা যদি গায়ে ময়লা মেখে বসে থাক, কে কি করবে বল? গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোবে। মাছি ভনভন্ করবে।

সেইজন্যে ঠিক বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করব এ-কাহিনী। অনেক ভেবেছি, অনেক লিখেছি, অনেক ছিঁড়েছি। ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারি নি। তারপর হঠাৎ মনে হল, পুণ্য কথা যে ভাবেই শুরু কর, কোন দোষ হবে না। রত্নাকর তো অনেক চেষ্টা করেছিলেন রাম নাম উচ্চারণের, কিন্তু পারেন নি। ঠোঁট দুটো জড়তায় থেমে গিয়েছিল, জিব আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। পারেন নি—তিনি রাম নাম উচ্চারণ করতে পারেন নি। তাতে কি হয়েছে? কেউ হতাশ হন নি, কেউ বলেন নি, রাম নাম উচ্চারণ তোমার দ্বারা হবে না। রাম নাম উচ্চারণ করতে না পারো তো কি হয়েছে? মরা উচ্চারণ কর। পুণ্য নাম যেভাবেই শুরু কর, একদিন না একদিন সেই পুণ্যময় স্বর্ণনামে পৌঁছে যাবে। মরা থেকে শুরু করলেও একদিন রাম নাম উচ্চারণ করতে পারবে, আর সেই ভরসাতেই শুরু করছি এ-কাহিনী।

পূর্ববঙ্গ খাল বিল নদনদীতে ভরা। পদ্মা, মেঘনা ছাড়াও হাজার হাজার নদনদী। ভৈরব থেকে চিত্রা, চিত্রা থেকে বুড়ীগঙ্গা, কত অসংখ্য নাম। শেষ করা যায় না। তেমনি খাল—লেবুগাতির খাল। চওড়ায় যে কোন নদীর সমান, আর গভীর যে কত বলা মুশকিল, কারণ যে একবার খালে পড়ে গেছে, সে আর উঠতে পারে নি, হাঙরে, কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে। এই রকম সংখ্যাতীত খালও আছে পূর্ববঙ্গে।

তখন পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ছিল না, শুধু বঙ্গদেশ ছিল। ইংরেজরা রাজত্ব করছে। ওদের রাজত্বে একশ বছর পূর্ণ হয়েছে বছর দশেক আগে। ঠিক একশ বছরের মাথায় সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে ব্যারাকপুর থেকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সংগ্রাম সার্থক হয় নি। আবার পরাধীন বৃটিশ সরকারের রাজত্বে।

একটি ছই তোলা নৌকো চলেছিল ফরিদপুর থেকে ঢাকার রাঢ়িখাল

গাঁয়ে। নৌকোর মধ্যে হাকিম ভগবানচন্দ্র, তাঁর গৃহিণী বামাসুন্দরীদেবী, ছ' বছরের বালক পুত্র জগদীশ, জগদীশের দেখাশোনা করার জন্যে মাধব, জগদীশের ভগ্নী আর দাসদাসী।

জগদীশ, তার ছোটবোন আর মাধব নৌকোর একপাশে বসে গল্প করছিল। রাঢ়িখাল পৌঁছুতে অনেকদিন সময় নেবে, এ দিনগুলো কিভাবে কাটানো যাবে, ভাবতে ভাবতে জগদীশেরও যেমন খারাপ লাগে, মাধবেরও তেমনি খারাপ লাগে।

শীতকাল, শান্ত নদনদী। ঝড়-বাতাসের চিহ্নও কোথাও নেই। নির্বিঘ্নেই এগিয়ে চলেছে হাকিম ভগবানচন্দ্রের ছই তোলা বিরাট নৌকো। মাধব আর জগদীশ গল্প করছে। ছোটবোন মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আচ্ছা মাধবদা—তোমার গায়ে এইসব কাটা দাগ, এ-গুলো কী?

জগদীশ মাধবের গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ওমা! জানো নি বুঝি—আমি যে মস্ত ডাকাত-সর্দার ছিনু। যখন ডাকাতি করতাম, লোকে বল্লম, সড়কী, ছোরা, ভোজালী দিয়ে মারামারি কাটাকাটি করত, সেই সবেরই দাগ আর কি!

জগদীশ আশ্চর্য হয়ে মাধবের শুকনো ক্ষতের ওপর হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল—তোমাকে এত মারত—তুমি মারতে না?

—প্রথমে না। আমি যে সর্দার গো—কি করতাম জানো? যেই দেখতাম গাঁয়ের লোক আমাদের ধরতে আইছে, অমনি আমি একপাশে চলে যেতাম, দলকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিতাম। আমার কাছে আলো রাখতাম, দল একদম অন্ধকারে পালিয়ে যেত। আমার আলো দেখে গাঁয়ের লোক আমার দিকে ছুটে আসতো। আমিও তাদের খানিকটা দূরে নিয়ে যেতাম। আমাকে মারধোর করত, আমি মার খেতাম আর এমন ভাব দেখাতাম, এক্ষুণি ধরা পড়ে যাব। ব্যস, গাঁয়ের লোক আরও ছুটতো। এমন সময় অন্ধকার থেকে জোরে শিস বেজে উঠত। শিস্ বাজলেই বুঝতে পারতাম আমার লোকেরা দূরে চলি গেছে, আর তাদের কেউ ধরতি পারবে না। অমনি আমি আলো নিবিয়ে, রণপায়ে চড়ে, হা-রে-রে করে সবকটাকে কচু-কাটা করে, দলে এসে ভিড়তাম। দলের লোকগুলোকে বাঁচাবার জন্যে গাঁয়ের লোকগুলোকে মারতে দিতাম বলে কাটা দাগগুলো রয়ে গেছে।

অবাক্ দৃষ্টিতে বালক জগদীশ মাধবের ক্ষতবিক্ষত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবাক্ হয়ে ভাবে, মানুষ এত কষ্ট সহ্যও করতে পারে?

জগদীশকে চুপ থাকতে দেখে মাধব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল—ও কি! দাদাবাবু, তুমি যে চুপ করে গেলে? তুমি গল্প না বললে আমি আর বলব নি।

জগদীশ কি গল্প বলবে, ভেবে পেল না। তার ছোট্ট জীবনে তো আর

মাধবের মত ডাকাতির কাহিনী জমা নেই। জগদীশের খুব ইচ্ছে করে সে যদি মাধবের মত রণপায়ে চড়তে পারত, সে যদি বল্লম, তীর সড়কি ছুড়তে পারত—

—কিগো? কথা বলছো নি কেন? রাগ হয়েছে?

—না, না, কি গল্প বলব বল? জগদীশচন্দ্র হাসতে হাসতে কথা বলল।

জগদীশচন্দ্রের ঘন কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে মাধব উত্তর দিল—তুমি যা খুশী বল। তুমি যা বলবে, তাই সুন্দর হয়ে উঠবে গো।

জগদীশচন্দ্র একটু ভাবল! সেই গল্পটা মাধবকে বলবে। স্কুল থেকে ফেরবার পথে রহিম যে অদ্ভুত জিনিস দেখিয়েছিল, তার উত্তর সে খুঁজে পায় নি। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা যে কথা বলেছিলেন তা শুনে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু পুরোপুরি শান্তি হয় নি। কোথায় যেন একটু খোঁচা রয়ে গেছে।

—আচ্ছা মাধবদা, তুমি তো বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে, তুমি বলতে পারবে এটা কেন হয়?

—কি হয় সেটা তো আগে বলবে?

—সেদিন স্কুল থেকে আমি আর রহিম বাড়ি ফিরছিলাম। রহিম একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল—এই একটা ম্যাজিক দেখবি?

—দেখব—আমি জবাব দিলাম।

রহিম সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাছের পাতায় হাত দিল আর দেখতে দেখতে পুরো গাছটা লজ্জায় লতিয়ে পড়ল।

—ও মা! হবেই তো—ওর নাম যে লজ্জাবতী! তারপরই হাত-পা নেড়ে মাধব জগদীশচন্দ্রকে বলতে লাগল—আমরা যখন ডাকাতি করতাম, তখন বনে যেতে যেতে লজ্জাবতী লতা দেখতাম। যদি দেখতাম নুইয়ে আছে, বুঝতে পারতাম আগে কোন লোক গিয়েছে।

—কিন্তু কেন এমন নুইয়ে যায়?

জগদীশচন্দ্রের প্রশ্নে মাধব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এ ধরনের প্রশ্ন যে হতে পারে, সে ধারণাই তার ছিল না। সে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল্ করে জগদীশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। মাধব সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন থেকে অন্য জীবনে ফিরে এসেছে। সে হা-রে-রে করে ডাকাতি করত। ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানবাবুকে মাধব শ্রদ্ধা করত তাঁর বীরত্ব আর উদারতার জন্যে।

একবার ডাকাতি করতে গিয়েছে মাধবচন্দ্র। দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে হাকিমসাহেবের গাঁয়ে। গ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাড়িতে বাড়িতে আগুন, লুঠতরাজ, আনন্দের হুঙ্কার—হারে-রে-রে।

লুঠ করে পালাতে গিয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মাধব। সামনে হাতির পিঠে স্বয়ং হাকিমসাহেব, সঙ্গে পুলিসের দল। হাতে লাঠি বল্লম বন্দুক।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ভগবানচন্দ্র বললেন—যে যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে থাক। পালাবার চেষ্টা করেছ কি মৃত্যু অনিবার্য।

মাধবের শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে গেল। তার হাত থেকে বল্লম খসে পড়ল। রণপা এলিয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে ভগবানচন্দ্রের হাতির সামনেই পড়ে গেল মাধবচন্দ্র। মুহূর্তের মধ্যে ভগবানচন্দ্র হাতি থেকে নেমে মাধবচন্দ্রের পাশে বসে তার চোখেমুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে আমি কোন অসম্মান করব না। কিন্তু তুমি সাধারণ নিরীহ জন-সাধারণের ধনসম্পত্তি লুঠ করে পাপ করেছ, আদালতের বিচারে তোমার যে শাস্তি হবে, তোমাকে সে শাস্তি নিতেই হবে।

মাধব কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করল। বিচারে তিন বছরের জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে মাধব ঠিক করল ডাকাতির মত পাপ কাজ সে আর করবে না। সাধারণ মানুষের মত সৎভাবে জীবনযাপন করবে। এই চিন্তা করে নানা জায়গায় সামান্য চাকরির জন্য ঘুরল, কিন্তু জেলফেরত ডাকাত শুনে তাকে কেউ কোন কাজ দিতে ভরসা পেল না।

শেষ পর্যন্ত মাধব ঠিক করল সে হাকিম ভগবানচন্দ্রের কাছে হাজির হবে। তাঁকে বলবে, আপনি আমায় বলেছিলেন সৎভাবে জীবনযাপন করতে। এখন আমি ভালভাবে বেঁচে থাকতে চাই, কিন্তু কেউ আমাকে কাজ দেয় না। আমি কি করে বেঁচে থাকব বলতে পারেন?

পায়ে পায়ে মাধব হাকিমসাহেবের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাধব অবাক্ হয়ে গেল। সাহেবের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

একজন গ্রামবাসী পথ দিয়ে যাচ্ছিল; মাধব তাকে জিজ্ঞাসা করল—এখানে হাকিমসাহেব থাকতেন?

লোকটি মাধবের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল—হুঁ। দেখে মনে হচ্ছে ভিনগাঁয়ের লোক। তাই এ কথা জিগাচ্ছ।

লোকটির কথা শুনে মাধবের মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল রাগে। আগে হলে এক চড়ে লোকটাকে অজ্ঞান করে দিত, কিন্তু সে ঠিক করেছে, ভালভাবে শান্ত হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। যথাসাধ্য নিজেকে শান্ত রেখে মাধব উত্তর দিল—হ্যাঁ ভাই, আমি অন্য গাঁ থেকে আসছি।

লোকটি বিজ্ঞের মত উত্তর দিল—শোন নি? হাকিমসাহেব মাধব ডাকাতের দলকে ধরে জেলে দিয়েছিলেন! ডাকাতগুলো যাবার সময় শাসিয়ে গিয়েছিল, আচ্ছা, আমরা জেল থেকে ছাড়া পাই, তারপর তোমায় মজা দেখাব।

লোকটি মাধব ডাকাতের দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হেসে বলতে লাগল

—বাবা, ওর নাম মাধব ডাকাত। এ তল্লাটে কে না ওর নাম শুনেছে। তার সঙ্গে চালাকি!

মাধব অধৈর্যভাবে চিৎকার করে উঠল—মাধব ডাকাতের কথা পরে শুনব, আগে হাকিমসাহেবের কথা শুনি।

মাধবের চিৎকারে লোকটা কেমন ভয় পেয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল—জেল থেকে বেরিয়ে ডাকাতগুলো সাহেবের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

মাধব ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল আবার। পরিষ্কার বুঝতে পারল, তার দলের লোকেরা আগেই ছাড়া পেয়েছে, আর ছাড়া পেয়েই প্রতিশোধ নেবার জন্যে হাকিমসাহেবের বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

মাধব লোকটার হাত ধরে আবার চিৎকার করে উঠল—সাহেব! সাহেবের কী হল?

মাধবের ঝাঁকানিতে লোকটার হাত দুটো কাঁধ থেকে খুলে যাবার অবস্থা। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—এ-ভাবে আমাকে নিয়ে টানাটানি করলে, খবর যখন শেষ করব তখন আর একটা অঙ্গও আস্ত থাকবে না।

লজ্জা পেয়ে মাধব ছেড়ে দিয়ে বলল—সাহেবের জন্য মনটা বড্ড উতলা হয়েছে। তাই অমন ব্যভার করে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করে দাও ভাই। আগে বল সাহেব কোথায়?

—বাড়িতে আগুন লাগাতে সাহেব সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ছোট মেয়েটি পড়ে ছিল ঘরের ভেতর। উনি আবার ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকে চেপে বাইরে বেরিয়ে এলেন। উনিও বেরিয়ে এলেন মেয়েকে নিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাড়ির চাল আগুনে পুড়ে ভেঙে পড়ল।

লোকটি একটু থামল। মাধব পোড়া বাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখল। সত্যি! পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একমাত্র পোড়া ভিটে ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

লোকটি মাধবের দিকে তাকিয়ে বলল—ওই যে খাল পাড়ে নতুন বাড়ি দেখছ, ওই বাড়ি হাকিমসাহেব তৈরি করে এখন থাকেন।

মাধব লোকটির হাত ধরে বিনীতভাবে বলল—আমাকে একটু সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবে? তাঁর সঙ্গে আমার খুব দরকার আছে।

—চল আমিও ওঁর বাড়ি যাচ্ছি।

লোকটির পিছু পিছু মাধব ভগবানচন্দ্রের নতুন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটি মুরুব্বি চালে মাধবকে বলল—তুমি এখানে দাঁড়াও। ভেতর বাড়িতে তুমি যেতে পাবে না। আমি ভেতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি। সাহেব যদি ইচ্ছে করেন এসে দেখা করবেন। তা কত্তার কি পরিচয় দেব সাহেবের কাছে?

মাধব ধীর কণ্ঠে বলল—গিয়ে বলবে জেল থেকে বেরিয়ে মাধব ডাকাত এসেছে দেখা করতে।

—তাই বলব। লোকটি ভেতর বাড়ির দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠল—ওরে বাবাগো-মাগো, ডাকাত পড়েছে. মাধব ডাকাত এসেছে, ও বাবুগো, বাঁচাও।

লোকটি মুহুর্মুহু চিৎকার করতে করতে ভেতর বাড়ি ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে; গোঁ-গোঁ করতে করতে হাত-পা ছুড়তে লাগল। ভগবানবাবু ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকটিকে ওইভাবে হাত-পা ছুড়তে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে শ্যাম?

লোকটির নাম শ্যামচন্দ্র এতক্ষণে জানা গেল। শ্যামচন্দ্র ভগবানবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খুলল. তারপর তো তো করতে করতে বলল—মা-মা-ধব ডাকাত এয়েছে।

ভগবানবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে ধুতির কোঁচা মুঠোর মধ্যে নিয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায়?

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

—আমার সঙ্গে? ভগবানচন্দ্র গম্ভীর পদক্ষেপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দাওয়ার নীচে উঠোনের ওপাশে দাঁড়িয়েছিল মাধব।

ভগবানচন্দ্র ধীর পায়ে মাধবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাধব এক মুহূর্ত ভগবানবাবুকে লক্ষ্য করে, প্রণাম জানিয়ে বলল—আমাকে চিনতে পারেন কত্তা?

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ভগবানচন্দ্র হাত তুললেন, তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—আমার যা কিছু ছিল. সব তো তোমার লোক পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তুমি কি চাও? আমার প্রাণ? সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নিয়ে নাও। তবু একটা কথা জেনে রাখ, আমি কোন দিন অন্যায় কাজ করব না। আমি অন্যায়কে ভয় করি না। তুমি যদি মনে করে থাক আমি তোমাদের শাস্তি দেব না, আর তোমরা মনের সুখে ডাকাতি করবে, তাহলে তোমরা ভুল ভেবেছো। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তোমাদের বাধা দেব, তার চেয়ে তোমরা আমাকে মেরে ফেল। তোমাদের আশা পূর্ণ হবে, আমিও বাধা দিতে আসব না।

মাধব এক মনে ভগবানবাবুর কথাগুলো শুনছিল। একটি কথাও সে বলে নি। তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল, চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিল। ভগবানবাবুর কথা শেষ হবার পরও কয়েক মিনিট মাধব চুপ করে রইল, তারপর বলল, ডাকাতি ছেড়ে দিলে পেট চলবে কি করে?

—কেন? চাকরি করবে?

—কে কাজ দেবে? জেল থেকে বেরিয়ে আপনার কথা শুনেই কাজের

সন্ধানে ঘুরছি। জেলফেরত ডাকাত শুনে সবাই কপাট বন্ধ করে দেয়, কাজ দেওয়া তো দূরের কথা।

ভগবানবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—তুমি সত্যিই কাজ করবে?

—আপনি কাজ দিয়ে দেখুন—আমি আর পাপ ডাকাতি করব না।

—কি কাজ তোমাকে দেওয়া যায় মাধব? ভগবানবাবু পায়চারি করতে লাগলেন উঠোনের মাঝখানে। অল্পক্ষণ পরে ভগবানবাবু মাধবের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—বেশ। এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে কাজ দিলাম। তুমি আমার ছেলে জগদীশের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাকে স্কুলে নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে। তার দেখাশোনা করবে। আমার বাড়িতেই থাকবে, খাবে।

ভগবানবাবু কথা শেষ করে আবার বললেন—মাধব! তোমার লোকজন আমার বাড়ি পুড়িয়ে আমাকে মারার চেষ্টা করেছে, আর আজ থেকে আমি আমার প্রাণাধিক পুত্রকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ইচ্ছে হলে তুমি তাকে হত্যা কর। দেখা যাক ঈশ্বর আছেন কি নেই?

মাধব এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, পরক্ষণেই ভগবানবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠল—সাহেব, আমি বাঁচতে চাই। ভালভাবে বাঁচতে চাই। আমি জানতাম না, আমার দলের লোকেরা ছাড়া পেয়ে আপনার এই সর্বনাশ করে গ্যাছে। আমি কথা দিচ্ছি বাবু, জান দিয়ে আমি আপনার ঋণ শোধ করব।

সেইদিন থেকেই মাধব জগদীশের তত্ত্বাবধানে বহাল হল।

—অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

জগদীশচন্দ্র মাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। নৌকো দুলকী চালে এগিয়ে চলেছে। শীতের শান্ত নদী। কোথাও তুফানের চিহ্ন নেই। আকাশ পরিষ্কার নীল।

—কি উত্তর দেব দাদাবাবু? তোমার কথা শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

—কেন? আমি কী করলাম?

—ওই যে বললে লজ্জাবতী লতা কেন ছোঁওয়া লাগলে নেতিয়ে যায়? মাধব দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সভয় কণ্ঠে বলল—ই সব হচ্ছে তেনার খেলা। ই সব নিয়ে কখনো তক্ক করতে নেই।

জগদীশচন্দ্র আর প্রশ্ন করে মাধবকে ব্যতিব্যস্ত না করে আবার বলল—সেইজন্যে মাধবদা আমরা তোমার গল্প শুনি, তুমি আমাদের গল্প বল।

মাধব খুশীর মেজাজে নড়ে চড়ে বসে আবার গল্প বলতে শুরু করবে, জগদীশচন্দ্র বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু একটা কথা মাধবদা, যা বলবে সত্যি কথা বলবে। মিথ্যে গল্প শুনতে চাই না।

—বেশ, বেশ, তাই বলছি।

জগদীশচন্দ্রকে কোলের কাছে নিয়ে মাধব ডাকাত গল্প বলা শুরু করল। একেবারে সত্যি গল্প।

ফরিদপুরে মেলা বসেছে। মেলার এক অঙ্গ হল কুস্তি লড়াইয়ের খেলা। পুলিসে পুলিসে কুস্তি লড়াই। পুলিসের লোকেরা সব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোক। বিরাট বিরাট তাদের চেহারা। যেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া। বুঝলে দাদাবাবু, আমরা তো তাদের কাছে চুনোপুঁটি। দুই পালোয়ান খুব কুস্তি লড়ছে। গাঁয়ের লোক ভিড় করে দেখছে। আমিও দেখছি ভিড়ের ভেতর থেকে। তোমার বাবা চেয়ারে বসে লড়াই দেখছেন।

এক এক করে একটা দশাসই চেহারার পুলিস, অন্যসব পুলিসকে হারিয়ে জিতে গেল। এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ক্ষুদে পটকা চাষীভাই বেরিয়ে এসে তোমার বাবার কাছে প্রণাম করে বলল—সাহেব, আপনি যদি আমাকে ওই লোকটির সঙ্গে কুস্তি লড়তে দ্যান, আমি দেখিয়ে দেব বাঙালীর ছেলে কুস্তি লড়তে ভয় পায় না।

তোমার বাবা কী ভেবে ছেলেটিকে কুস্তি লড়ার অনুমতি দিলেন। ছেলেটি তোমার বাবাকে প্রণাম করে কুস্তিগীর পালোয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি ভিড়ের পেছন থেকে দেখছি আর হাসছি। হিন্দুস্তানী পালোয়ানটা ইয়া লম্বা-চওড়া আর চাষীভাই পালোয়ান এইটুকু ক্ষুদে। হিন্দুস্তানীর বুকের কাছেও তার মাথা পৌঁছয় না।

হুইসিল বাজল। দুজনে কুস্তি লড়া শুরু হল। ওরে বাব্বাঃ! ক্ষুদে পালোয়ান যেন পাঁকাল মাছ; হাতি পালোয়ান কিছুতেই ধরতে পারে না। যেই ধরে, হড়কে বেরিয়ে যায়, পরক্ষণেই পালটা ঘুরে পুলিস পালোয়ানকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। পুলিস যেই উঠে দাঁড়ায়, অমনি আবার ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দেয়। কিছুতেই পুলিস পালোয়ান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে যেন তেলা জমিতে পা পিছলে পড়ে আছাড় খাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এমন আছাড় খেতে খেতে পুলিসসাহেব চিৎপটাং। সে চিৎ হয়ে পড়ল, আর উঠতে পারল না। হাকিমসাহেব চাষী ভায়ের জিত হয়েছে ঘোষণা করলেন।

পুলিসটা হেরে যেতে খুব রেগে গেল। সে হঠাৎ চাষীভাইকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তার গলায় এক পা চাপিয়ে খুন করার চেষ্টা করল। সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নইলে লোকটা মরে যাবে।

কিন্তু গোঁয়ার-গোবিন্দ পুলিস কারুর কথা শোনে না। সে ব্যাটা লোকটার গলায় পা চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার বাবা চেয়ার থেকে নেমে সোজা পুলিসটার সামনে গিয়ে আদেশ দিলেন—ওকে ছেড়ে দাও।

গোঁয়ার পুলিস হাকিমসাহেবের কথাও শুনল না। পরের বার হাকিমসাহেব আর কোন কথা বললেন না—এক লাথি মারলেন পুলিসের পায়ের গোছে। পুলিস আবার চিৎপটাং। হাকিমসাহেব চাষীভাইকে দাঁড় করিয়ে বললেন—যাও! বাড়ি যাও।

হাকিমসাহেব আর কোন কথা না বলে মেলা ছেড়ে বাড়ি চলে গেলেন।

—তারপর? জগদীশচন্দ্র রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

সেই পুলিসটা অপমানে ফুঁসতে লাগল। তখন সে কিছুই করল না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মতলব আঁটল হাকিমসাহেবকে খুন করার। সে কথা সে ব্যারাকের অন্যান্য পুলিসকেও জানাল। ব্যারাকের বেশির ভাগ পুলিসই ছিল উত্তরপ্রদেশের দেশোয়ালী ভাই। তারা সকলেই পুলিসটার কথায় সায় দিল। ঠিক হল, সন্ধ্যের সময় হাকিমসাহেব যখন মেলায় যাত্রা দেখতে যাবেন, তখন মাঝপথের নির্জন গাছতলায় একা পেয়ে খুন করবে।

পুলিসটা গুপ্তি হাতে ঘাপটি মেরে বসে রইল গাছের আড়ালে। গুপ্তি কাকে বলে জানো তো? বাইরে থেকে মনে হবে লাঠি, কিন্তু লাঠির মাঝখানে ফাঁপা, আর তার মধ্যে পোরা আছে ধারালো সোজা তলোয়ার। তলোয়ারের বাঁটের সঙ্গে খাপের প্যাঁচ এমনভাবে আঁটা যে বাইরে থেকে লাঠি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

পুলিসটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু সাহেবের দেখা নেই। আরও কিছুক্ষণ পরে একটা পুলিস ছুটে এসে দেশোয়ালী ভাইকে জানালো হাকিমসাহেব অন্য রাস্তা দিয়ে মেলায় যাত্রা দেখতে গেছেন। এ রাস্তায় আসবেন না।

পুলিসটার মাথায় তখন খুন চেপে গেল। যে ভাবে হোক সাহেবকে খতম করবে সে। মেলায় গিয়ে হৈ-হট্টগোল লাগিয়ে দিল। তার সাঙ্গোপাঙ্গোরাও গোলমাল শুরু করে দিল। চারদিকে মারামারি কাটাকাটি। যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল।

হাকিমসাহেব একখানা লাঠি একজনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁক দিয়ে বলে উঠলেন—সকলে লাঠি ফেলে দাও। শান্ত হও।

অন্যসব পুলিস ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাঠি মাটিতে ফেলে দিল, কিন্তু সেই কুস্তিগীর পালোয়ান পুলিস কোন কথা কানেই তুলল না। সে তার গুপ্তি লাঠি নিয়ে হাকিমসাহেবের দিকে তেড়ে এল।

হাকিমসাহেব এক বিন্দু ভয় পেলেন না। তিনিও বজ্রের মত শক্ত হাতে লাঠি ধরে আঘাত করলেন পুলিসের লাঠিতে। পুলিসও পালটা আঘাত

করল। হাকিমসাহেব এবার এত জোরে আঘাত করলেন যে, পুলিসের হাত থেকে লাঠির খাপটা ছিটকে গেল, বাঁটটা তার হাতে ধরাই রইল। সকলে অবাক আতঙ্কে দেখল, পুলিসটা ধরে আছে লাঠি নয়, ধারালো গুপ্তি ছোরা, যার আঘাতে যে কোন মুহূর্তে হাকিমসাহেবের মৃত্যু ঘটতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিসটার ওপর। কেড়ে নিল গুপ্তি তার হাত থেকে। সে লোকটাও তার অপরাধ বুঝতে পারল সাহেবের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। ভগবানচন্দ্র তার মাথায় হাত দিয়ে ক্ষমা করে বললেন—এ রকম পাগলামি আর করো না। যাও, মন দিয়ে সৎভাবে কাজ কর।

জগদীশচন্দ্র অবাক হয়ে মাধবের কাহিনী শুনছিল, কিন্তু বাবার ডাকে বাধা পড়ল।

ভগবানচন্দ্র মাধবকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মাধব! শীত পড়ে গেছে। আর বাইরে থেকো না। ছইয়ের ভেতর যাও।

মাধব জগদীশকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—কথাটা সত্যি দাদাবাবু, তা ছাড়া এদিকটা ভাল নয়। বড্ড ডাকাতের ভয়।

জগদীশচন্দ্রের গা ছমছমিয়ে উঠল। যদি তাদের নৌকোয় ডাকাত পড়ে? কোন কথা না বলে মাধবের কোঁচড় চেপে ধরে বালক ছইয়ের ভেতর ঢুকল। বামাসুন্দরীদেবী জামবাটিতে করে দুধ, গুড়, মুড়ি ভিজিয়ে সকলের হাতে এক এক বাটি দিলেন। মাধবও বাদ গেল না। সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া শুরু করল। বাইরে নদীর বুকে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই নজরে পড়ে না, শুধু জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। দূরে নদীর পাড়ে শেয়াল ডাকছে। শেয়ালের ডাকে ভয় পেয়ে কুকুরগুলো জড় হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে ডাকছে। দূরে হয়ত কোন নৌকো যাচ্ছে, তার আলো নজরে পড়ছে। মাঝে মাঝে মাঝিদের ভাটিয়ালী সুরের গান কানে আসছে। সব জড়িয়ে কেমন একটা গা ছমছমানি ভাব।

—রাঢ়িখাল পৌঁছুতে আর কদিন লাগবে? বামাসুন্দরীদেবী নির্জনতা ভঙ্গ করলেন।

দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে ভগবানচন্দ্র ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—এখনও দু'দিন।

—এ ভাবে নৌকোতে যেতে আর ভাল লাগছে না বাপু। বামাসুন্দরীদেবী বিরক্তির সঙ্গেই কথাগুলো বললেন—এ এক বন্দীদশা। ছেলেমেয়েগুলো না পারছে খেলতে, না পাচ্ছে একটু ভাল খেতে।

বামাসুন্দরীদেবীর কথা শেষ হল না, তার আগেই খালের ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ শিস বাতাস চিরে ভেসে এল। বিকট অদ্ভুত শিসের শব্দে

সকলেই শিউরে উঠল। জগদীশ মাধবের কোলে মুখ লুকোল। ছোটবোন বাবার কোলে মুখ ঢাকল।

—ও কিসের শব্দ মাধব? উৎকণ্ঠিত ভগবানচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু মাধব কোন কথা বলার আগেই সেই তীক্ষ্ণ শিস বারবার বেজে উঠল। এবার আর খালের মধ্যে নয়, একেবারে নদীর বুকে, ওদের নৌকোর কাছাকাছি।

তীক্ষ্ণ শিস—একটি—দুটি—তিনটি—

মাধব মুহূর্তমধ্যে কঠিন মূর্তিতে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে বলল—বাবু! ডাকাতের নৌকো আমাদের পিছু নিয়েছে।

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে বামাসুন্দরীদেবী বললেন—কি হবে তাহলে?

—আমি বন্দুক নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। ভগবানচন্দ্র ছইয়ের বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে মাধব ভগবানবাবুর পা চেপে ধরে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল—ও কাজও করবেন না। আপনি বাইরে গেলেই ওরা সড়কি ছুড়ে মারবে, আর আপনি বন্দুক তুলে ধরার আগেই অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন।

ভগবানবাবু এবার ভীত হয়ে ছইয়ের মধ্যে বসে পড়ে বললেন—তা হলে কি হবে মাধব?

—আপনারা আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বসে থাকেন। খবরদার, আমি না বলা পর্যন্ত ছইয়ের বাইরে যাবেন না।

মাধব কথাগুলো ফিসফিস করে বলল। সকলেই মাধবের কথামত আলো নিবিয়ে ছইয়ের মধ্যে জড়াজড়ি করে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। মাধব হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে, তারপর ছইয়ের মাথায় চড়ে বিকট শিস দিয়ে উঠল।

জগদীশচন্দ্রের হৃদপিণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল। ভয় লুকোবার জন্যে বাবার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল।

আবার শিস। একবার—দু'বার—তিনবার। মাধব পরপর বিচিত্রভাবে শিস দিল অন্ধকারের মধ্যে।

এবার ডাকাতের নৌকো থেকে শিস ভেসে এল। একবার—দুবার—দীর্ঘতর শিস।

কিছুক্ষণ পরে মাধব আবার শিস্ দিয়ে উঠল। একবার-অনেকক্ষণ, লম্বা ধরনের শিস।

ডাকাতের নৌকো থেকে শিসের উত্তর এল—লম্বা ধরনের শিস্, যেমন মাধব দিয়েছিল ঠিক তেমনি ধরনের শিস। ক্রমশ শিস দূরে চলে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। মাধব আর একবার শিস্ দিল অন্ধকারের ভেতর কিন্তু কোন উত্তর এল না। ও কিছু-

ক্ষণ অপেক্ষা করে দুইয়ের মাথা থেকে নেমে মাধব হাসতে হাসতে বলল—এবার আপনারা আলো জ্বালতি পারেন কত্তা। ওরা চলি গিয়েছে।

বামাসুন্দরীদেবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি আলো জ্বাললেন। ভগবানচন্দ্র মাধবকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওদের কি বললে যে ওরা চলে গেল?

মাধব লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি শিস দিয়ে ওদের বললাম—আমরাও ডাকাত, ডাকাতি করতে বেরিয়েছি। ওদের সঙ্গে লড়াই লাগলে কোন পক্ষেরই লাভ হবে না; তোমরা আলাদা পথ দেখ, আমরা আলাদা পথ দেখি। ওরা চলে গেল।

ভগবানচন্দ্র অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, একজন দাগী আসামী তারই শাস্তিকর্তার সংসারকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথ থেকে বিনা স্বার্থে রক্ষা করল। হাকিমসাহেবের চোখ ছলছল করে উঠল।

॥ দুই ॥

শব্দহীন নিত্য কোলাহলে

স্কুল ছুটি হতেই অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে জগদীশও পথে বেরিয়ে এল। ফরিদপুরে মাত্র একটা জেলা স্কুল ছিল। ওই স্কুলে সমস্ত ছাত্র সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া সে সব স্কুল বড়লোকদের ছেলেদের জন্যে। গরিব ছেলেদের পড়ার স্থান ছিল না বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে একটা বাংলা বিদ্যালয় খুললেন। সেই স্কুলে গরিব দুঃখী, জেলে, কুমোর, হিন্দু, মুসলমান সকলের ছেলেই সমানভাবে ভরতি হবার সুযোগ পেল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে জগদীশও ভরতি হল বাবার তৈরি স্কুলে।

—দাদাবাবু, তুমি আমার কাঁধে চড়। মাধব বইখাতাগুলো জগদীশের হাত থেকে নিয়ে বলল।

—না। লাজুক লাজুক কণ্ঠে জগদীশ উত্তর দিল—রহিম, ফকির ওরা সব ক্ষ্যাপায়—

মাধব একটু রাগের সুরে উত্তর দিল—রহিম, ফকির—ওরা আবার কে?

—জানো না? জগদীশচন্দ্র রহিম আর ফকিরের পরিচয় দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে পড়ল—রহিম হল বাবার চাপরাশী মহীউদ্দিন—তার ছেলে। ক্লাসে আমার ঠিক ডান পাশে বসে আর ফকির হল অবিনাশ জেলের ছোট ছেলে, আমার বাঁ দিকে বসে।

জগদীশচন্দ্র কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে। মাধব জগদীশচন্দ্রের হাত চেপে ধরে বলল—ওটি হবে নি দাদাবাবু। কথায় কথায় আমায় ভুইলে তুমি হাঁটতি লাগবে, তা হবে না, কাঁধে ওঠ।

—না, হেঁটে যাব। ওরা আমাকে ক্ষ্যাপায়। আমি কক্ষণো কাঁধে উঠবো না।

জগদীশচন্দ্র মুখ কাঁদো কাঁদো করে দাঁড়িয়ে থাকে! মাধব তার দাদাবাবুর গম্ভীর কালো মুখ দেখে চুপ থাকতে পারে না, তার প্রাণটা কেমন আকুলি-বিকুলি করে। সে চটপট করে বলে উঠল—আচ্ছা বাবা। রাগ করতি হবে না। হেঁটেই চল, তবে আমার একটি কথা শুনতি হবে।

—কি কথা? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল জগদীশ।

—তুমি আমার হাত ধরে হাঁটবে।

জগদীশ এবার হেসে ফেলল। হেসে উত্তর দিল—বেশ, তাই হবে।

জগদীশের হাত ধরে মাধব তাকে নিয়ে নদী কিনারার পথ দিয়ে হেঁটে চলল। যেতে যেতে নিজের মনেই গজরাতে লাগল—পেথমেই বাবুকে কইছিলাম, অমন ইস্কুল কক্ষণো কত্তে নাই, যেখানে একসঙ্গে বামুন, কায়েত, জেলে, কৈবত্ত সব বসে পড়বে।

—কি বলছ মাধবদা? জগদীশ এবার একটু রাগের ঝাঁঝে উত্তর দিল এ ধরনের কথা কক্ষণো বলবে না বলছি। তা হলে আর আমি তোমার সঙ্গে থাকব না।

মাধব জিব কেটে, নিজের দু'কান ধরে, বলল—এবারকার মত মাফ করে দাও দাদাবাবু, আর কক্ষণো এমন কথা বলব না।

জগদীশচন্দ্র হেসে বলল—বেশ। এবারের মত মাপ করে দিলাম।

দু'জনে নদীর পাড় ধরে হেঁটে চলেছে। এঁটেল মাটির পথ। পিছল অথচ নরম নরম গদির মত মাটি। এই রকম নরম মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে ভারি মজা লাগে জগদীশচন্দ্রের, তার চেয়েও ভাল লাগে ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী তরতরিয়ে। গভীর নদী। দু' ধারে আম কাঁঠাল জাম গাছের গভীর বন। মাঝে মাঝে স্নানের ঘাট। ঘাটের চারপাশে এমনভাবে বাঁশ দিয়ে বেড়া বানানো রয়েছে যে, নদীর জল থেকে ঘাটের জল সম্পূর্ণ আলাদা। বাঁশের ফাক দিয়ে জল শুধু ঘাটের দিকে চলে আসে, এ ছাড়া একটা মাছও বেড়ার ফাঁক দিয়ে এদিক-ওদিক করতে পারবে না।

—আচ্ছা মাধবদা, সব ঘাটেতেই এভাবে বেড়া দেওয়া কেন? লোকে একদম সাঁতার কাটতে পারে না।

মাধব চোখ দুটো ছানাবড়ার মত বড় করে বলল—কি বলছো দাদাবাবু! বেড়া খুলে দিলে আর একটি লোককেও আস্ত রাখবে না।

—কে ?

—নদীতে অনেক হাঙর আছে। হাঙরগুলোর দাঁত খুব ধারালো। দাঁত দিয়ে পা কেটে নিলেও প্রথমে কেউ বুঝতে পারে না। বেড়া না দিলে কি হবে জানো তো? কেউ চান করতে নামল, আর হাঙরটা জলের তলা দিয়ে এসে কট করে লোকটার পা কেটে দু'খানা করে পালিয়ে যাবে। যাতে হাঙর কুমীর ঘাটে আসতে না পারে, সেই জন্যে অমন বেড়া দেওয়া আছে।

বালক জগদীশের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে একটি লোক স্নান শেষ করে সূর্যপ্রণাম করছেন হাতজোড় করে আর তীক্ষ্ণদন্তী একটি হাঙর নিঃশব্দে তার পা কেটে নিয়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে জায়গাটির জল রক্তে লাল হয়ে গেল আর লোকটি অজ্ঞান হয়ে জলের মধ্যেই পড়ে গেল।

—কি দাদাবাবু? কথা বলছো নি কেন? মাধব জিজ্ঞাসা করল। বালক জগদীশ চুপ করে থাকলে ডাক-সাইটে ডাকাতের কেমন ভয় ভয় করে। ভাল লাগে না। জগদীশচন্দ্র বকবক করে, আবোল-তাবোল কথা জিজ্ঞাসা করে আর মাধব তার নিজের মত করে উত্তর দিতে খুব ভালবাসে। চুপ করে থাকলেই কেমন অসহায় বোধ করে দুর্ধর্ষ ডাকাতসর্দার।

—দাদাবাবু, কথা বল।

জগদীশচন্দ্রের যেন হুঁশ এল। সে কি চিন্তা করছিল সেই জানে, কিন্তু কেমন যেন বিমনা হয়ে গিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র যেন অনেক দূর থেকে অচেনাকণ্ঠে কথা বলল—মাধবদা, হাঙরগুলোকে কি করে মারা যায় বল তো?

মাধবচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের মুখে কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা। সে মুহূর্ত-মধ্যে দাদাবাবুকে কাঁধে তুলে ছুটতে ছুটতে উত্তর দিল—তুমি যখন বড় হবে, মস্তবড় বীর হবে। তখন একটা তীরেই সব হাঙরগুলোকে মেরে ফেলবে।

জগদীশচন্দ্র মাধবের কাঁধে চড়ে বনপথ দিয়ে এগিয়ে চলল। মাধব দুলকী চালে হাঁটতে লাগল আর মুখে সুর করে বলতে লাগল—হুম্ না, পাল্‌কী চলে, হুম্ না।

—আচ্ছা মাধবদা, তুমি রণপা চড়তে পারো?

মাধব এবার হো-হো করে হেসে উঠল। সে হাসতে হাসতে বলল—রণ-পাই যে আমার পা ছিল গো। এমনি পায়ে হাঁটতে একটুকুও ভাল লাগে না। কেমন থপথপ করে হাঁটতে হয়।

—তুমি রণপায়ে চড়ে কি করতে?

—ডাকাতি করতাম। ধর, এ গাঁ থেকে সে গাঁ দশ ক্রোশ পথ। খালি

পায়ে হাঁটলে দশ পহর লেগে যাবে। রণপায়ে চড়ে দু' ঘণ্টায় ডাকাতি করে আবার নিজের ডেরায় ফিরে আসতাম। পুলিস টেরও পেত না।

অবাক হয়ে বালক জগদীশচন্দ্র মাধবের কথা শুনে যায়। রণপা চড়া থেকে ডাকাতি করে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্ত ছবিই বালকের মনের ওপর চলচ্চিত্রের মত ফুটে ওঠে।

—কি দাদাবাবু? আবার চুপ করে গেলে যে?

বালকের তন্ময়তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসে। অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর জগদীশ আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা মাধবদা, বড় মাছ নাকি ছোট ছোট মাছগুলোকে গিলে খেয়ে নেয়?

—হ্যাঁ গো! অনেক বড় মাছ আছে যেগুলো ছোটগুলোকে গিলে ফেলে।

জগদীশচন্দ্র কোন কথা বলে না। তার মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ভেবে পায় না, কেন বড় মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে? বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এসব প্রশ্নের উত্তর মাধবদা দিতে পারবে না।

—কি দাদাবাবু? তুমি কথা বলছো নি কেন?

মাধব কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। জগদীশচন্দ্র চুপ থাকলে মাধবের কেমন অস্বস্তি লাগে, সে ভাবে, দাদাবাবু বোধ হয় তার ওপর রাগ করেছে।

—কি দাদাবাবু? আবার চুপ করে গেলে যে?

বালক জগদীশচন্দ্র কি যেন ভাবছিল, মাধবের ডাক এবং ঝাঁকানিতে সম্বিৎ ফিরে এল। সে আনমনা হয়ে বলল—তুমি আমায় রণপা চড়া শিখিয়ে দেবে?

—না দাদাবাবু, ওসব পাপ কাজ শিখে কাজ নেই। রণপা চড়ে ডাকাতির জন্যে। তুমি কি ডাকাতি করবে? তুমি বড় হয়ে বাবার মত মস্ত হাকিম হবে। কতলোকের ভাল করবে।

মাধবের কথা শুনতে শুনতে বালকের মনে স্বপ্নের রামধনু ভেসে উঠল। সে যেন কত বড হয়ে গেছে, মস্তবড় অফিসার হয়ে, কোটপ্যাণ্ট পরে অফিসে কাজ করছে। পিওন সেলাম করছে, পাঙ্খাওয়ালা পাখা টেনে হাওয়া করছে। বেয়ারা ঠাণ্ডা কলসী থেকে জল গড়িয়ে দিচ্ছে। বাবার জন্যে সকলে যেমন করে ঠিক তেমনি এলাহি ব্যাপার চলছে চারদিকে।

মাধবের মনে ভয়, সে বোধ হয় দাদাবাবুকে কঠিন কথা বলে ফেলেছে। সেই অভিমানে দাদাবাবু কথা বলছে না।

—না, না, দাদাবাবু, তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। বাবুকে জিজ্ঞেস করে আমি তোমায় রণপা চড়া শিখিয়ে দেব।

জগদীশচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বলল—মাধবদা, এবার আমায় নামিয়ে দাও, আমি হেঁটে যাব।

মাধব দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর দিকে তাকিয়ে জগদীশচন্দ্রের মুখ দেখার চেষ্টা

করল, কিন্তু দেখতে পেল না। বুঝতে পারল না দাদাবাবু রাগ করে বলছে, না খুশি হয়ে বলছে। একবার সে ভাবল দাদাবাবুকে নামিয়ে দেবে, তাহলে অন্ততঃ দাদাবাবুর মুখ দেখতে পাবে; পরক্ষণেই ভাবল, বনপথে না নামানোই ভাল। শেয়াল কুকুর তো আছেই, তারমধ্যে হঠাৎ আবার কখন যে সাপখোপ বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। এই পথটুকু পার করে নামিয়ে দিলেই সবচেয়ে ভাল। সে খুব মিষ্টি সুরে বলল—এই পথটুকু কাঁধে চল দাদাবাবু। সাপেখোপে কাটতে পারে।

সে কথার উত্তর না দিয়ে জগদীশচন্দ্র সামনের লজ্জাবতীর পাতা ছুঁয়ে আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠল—দেখো, দেখো, মাধবদা, কেমন মজা।

মাধবও দেখল। এর আগেও বহুবার এ জিনিস দেখেছে, শুনেছে, তবু দাদাবাবুর কথায় নতুন করে ভাল লাগল। একজন জেল-ফেরত দুর্ধর্ষ ডাকাত একটি বালককে এত গভীরভাবে ভালবেসেছিল যে, তার সবকিছুই মাধবের কাছে অপূর্ব লাগত।

মাধব দেখল বালক জগদীশচন্দ্র একটির পর একটি লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁয়ে চলেছে আর পাতাগুলো মানুষের ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ খেলা করার পর মাধব জগদীশকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথে ছুটল। জগদীশ কাঁধে চড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে চলল। এমনিভাবে তাকিয়ে থাকতে তার ভারী ভাল লাগে।

—মাধবদা, মাধবের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লাগামের মত টেনে ধরে জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল—নারকোলের মধ্যে জল হয় কি করে?

মাধব থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এ ধরনের প্রশ্ন সে কখনও শোনে নি। এ প্রশ্নের উত্তরও যে কি হবে তাও সে বাপের কালেও বলতে পারবে না। তবু দাদাবাবুকে খুশী করার জন্যে সে বলল—এ সবই ভগবানের খেলা দাদাবাবু।

তারপর দাদাবাবুকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে মাধব বাড়িমুখো ছুট দিল জগদীশচন্দ্রকে কাঁধে নিয়ে।

সকলের চেয়ে আনন্দিত বালক জগদীশচন্দ্র। রাতে যাত্রার আসর বসবে সদরে। ভগবানচন্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর বাড়ির মেয়েরা যেমন যাত্রা দেখবেন, ঠিক তেমনি গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ যাত্রা দেখে আনন্দ করবেন। কারুর কোন বাধা থাকবে না যাত্রা দেখার। জগদীশচন্দ্র চাদর গায় দিয়ে ভগবানচন্দ্রের কাছে বসে যাত্রা দেখার খুশীতে ডগমগ হয়ে গেল। সন্ধ্যে রাতের মধ্যেই সে তার পড়াশুনা শেষ করে ফেলল। মাধবকে তাড়া দিল রাত্তিরের খাওয়া শেষ করতে। মা ওদিকে রান্না শেষ করে ফেলেছেন। ছেলেমেয়ে দাসদাসীদের

খাইয়ে, তিনিও যাত্রা দেখতে আসবেন, তাই ভগবানচন্দ্র আদেশ দিয়েছেন সন্ধ্যের আগেই যেন সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যায়।

সন্ধ্যেবেলায় বাবার সঙ্গে বসে খাওয়া শেষ করল জগদীশচন্দ্র। আজ মহাভারতের পালা হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। জগদীশচন্দ্রের বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য শিহরণ। কিছুটা ভয়, কিছুটা আনন্দ, কিছুটা অজানা অনুভূতির স্পন্দন। বাবার কোলের কাছে চাদর মুড়ি দিয়ে মুখটুকু বার করে জগদীশচন্দ্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে আসরের দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে গোল হয়ে দর্শকের দল বসে আছেন। একপাশে চিকের আড়ালে গ্রামের মা-বোনেরা। ওখানে নিশ্চয়ই মা বসেছেন কোন গ্রামবাসিনীর পাশে। জগদীশচন্দ্র এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখল অদূরে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে মাধব। ওর দিকে তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে। ওকে দেখে ভারী ভাল লাগল জগদীশের। ও যেন কতকালের চেনা। জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়।

আসরের মাঝখানে সরু পথ। সেই পথ চলে গিয়েছে সাজঘর পর্যন্ত। সাজঘর থেকে সরু পথ আসরের মাঝখানে এসে শেষ হয়েছে। সেখানে অনেকখানি জায়গা গোল; সেই গোল জায়গার চারদিকে বাজনদারেরা নানা রকম বাজনা নিয়ে বসে আছেন।

বাজনা বেজে উঠল। জগদীশচন্দ্রের বুকের মধ্যে আশ্চর্য স্পন্দন। বাজনার পরে গান, তারপরে যাত্রাভিনয়। সমস্ত রাত্রি যাত্রাপালা অভিনয় হল হাকিম সাহেবের বাড়ির সামনে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই হয়ত হাজির ছিল আসরে। কিন্তু সবাই যাত্রার শেষ অবধি নাও দেখতে পারে, অনেকে হাই তুলেছে, অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু বালক জগদীশচন্দ্র তন্ময় হয়ে শেষ পর্যন্ত যাত্রা দেখেছে। তার বালকমন কর্ণের চরিত্র দেখে অভিভূত। একজন মানুষের জীবনে এত ব্যর্থতা আসতে পারে, আর সেই ব্যর্থতাকে বার বার জয় করে তিনি যশের শিখরে উঠেছিলেন! রামায়ণ মহাভারতে অনেক আদর্শ চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু কর্ণের মত বীরচরিত্র আর নেই। বালক জগদীশচন্দ্রকে কর্ণচরিত্র এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেল, সে নাড়া বোধ হয় চিরজীবনের মত শব্দহীন নিত্য কোলাহলে প্রাণকে চঞ্চল করে তুলত।

যাত্রার রেশ কেটে যাবার পরই জগদীশচন্দ্র আবার সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। লজ্জাবতী লতা কেন মানুষের স্পর্শে নির্জীব লতিয়ে যায়? বড় বড় মাছ কেন ছোট ছোট মাছ খেয়ে নেয়?—কে দেবে এর উত্তর?

ভগবানচন্দ্রের সামনে গিয়ে জগদীশচন্দ্র নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ভগবানচন্দ্র নিজের কাজ করছিলেন, প্রথমটা খেয়াল করেন নি, তারপর জগদীশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বল। নিজের কাগজপত্র সরিয়ে রেখে উৎসুক হয়ে পুত্রের দিকে তাকালেন।

—আমরা যদি লজ্জাবতী লতা ছুঁই অমন নেতিয়ে পড়ে কেন?

জগদীশচন্দ্রের প্রশ্নে ভগবানচন্দ্র মনে মনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলের মনে যে প্রশ্নের উত্তর বার বার ঘুর বেড়াচ্ছে, সে উত্তর এত সহজে পাওয়া সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে তিনি নিজেকে এত বিদ্বান ভাবেন। গ্রামের লোক তাঁকে বিদ্বান ভেবে সম্মান করেন, কিন্তু তিনিও এর উত্তর জানেন না। কিন্তু তিনি ছেলেকে মিথ্যে বা ভুল কথা বললেন না। তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে বললেন—দেখ বাবা, আমি তো অত বিজ্ঞান জানি না, তাই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারব না, তবে এ বিষয়ে আমি আমার ধারণা বলতে পারি।

জগদীশচন্দ্র বাবার পায়ের কাছে বসে আনন্দে বলে উঠল—তাই বলুন বাবা।

ভগবানচন্দ্র চোখ বন্ধ করে ধীরভাবে বলতে লাগলেন—প্রাচীন ভারতের মানুষ অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। এঁদের ঋষি বলতেন। এঁরা নানা বিষয়ে গবেষণা করতেন, লেখাপড়া করতেন, সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দিতেন। এঁরা বলতেন আমাদের মতই বৃক্ষের প্রাণস্পন্দন আছে, আমাদের মতই বৃক্ষ-লতাদির অনুভূতি আছে। সেই রকম লজ্জাবতী লতার দেহে অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতির জন্যই বোধ হয় আমরা স্পর্শ করলে এই রকম লজ্জানুভূতিতে নুইয়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র তন্ময় হয়ে শুনছে। পিতা আবেগময় কণ্ঠে বলছেন—আমাদের দেশে একদিন চরক, সুশ্রুত, জীবক, নাগার্জুনের মত জ্ঞানী চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কত উন্নতি। তারপর মুসলমান শক্তি আমাদের দেশ আক্রমণ করে জয় করল। তারা রাজত্ব বিস্তার করল। ক্রমশ হিন্দু সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল।

মুসলমান রাজত্বের পর এ দেশে স্থায়ীভাবে রাজত্ব শুরু করল ইংরেজরা। ওরা এ দেশ পরিচালনা করে, এ দেশ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। আমাদের দেশের কোন উন্নতিই সাধিত হয় না। ওরা কল্পনা করতেই পারে না, আমাদের দেশে বিজ্ঞান নিয়ে কেউ গবেষণা করতে পারেন।

ভগবানচন্দ্র থামলেন। জগদীশচন্দ্র পাথরের মত নিশ্চল নিস্পন্দ। সে কি ভাবছে কে জানে? তার মন কোথায় কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না।

ধীরকণ্ঠে ভগবানচন্দ্র ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—যদি আমাদের দেশের কোন বৈজ্ঞানিক তোমার প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করে সার্থক হন, তাহলেই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে।

জগদীশচন্দ্র একইভাবে নিথর হয়ে বসে রইল।

মাধবের চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ডাকসাইটে ডাকাতের চোখে জল। রত্নাকর যেন বাল্মিকীতে রূপান্তরিত। নিষ্ঠুর ডাকাতের দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে বিদায়ের অশ্রুজল।

ভগবানচন্দ্র চিঠির ওপর স্বাক্ষর করে সযত্নে চিঠিটি ভাঁজ করলেন, তারপর একটি খামে পুরে খামের ওপর ইংরিজী হরফে লিখলেন: টু হুম্ ইট মে কনসার্ন্।

খামটি টেবলের ওপর রেখে ভগবানবাবু মাধবের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি করব মাধব? সরকারি চাকরি। প্রমোশন হয়েছে, না বললে সরকার রাগ করবেন।

ভগবানবাবু কথা বলছিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছিল। হাকিম সাহেবের কণ্ঠস্বরে যেন আসন্ন কান্নার আর্দ্র স্বর।

—আমি বর্ধমানে বদলি হয়েছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর আমার সঙ্গে যেতে পার।

ভগবান নিজের কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন: তবু মেঘলা আকাশে এক ঝলক বৃষ্টি যেমন হয়ে যায় তেমনি ভাবেই কণ্ঠস্বরটা মাঝে মাঝে ভিজে উঠছিল।

—কর্তাবাবু, বর্ধমান যে অনেক দূর। নইলে নিশ্চয়ই যেতাম। আমি অতদূরে চলে গেলে, আমার ছেলে বউ না খেয়ে মারা যাবে।

মাধব কথা বলতে বলতে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছল। কান্নার বেগ সামলাতে মাঝে মাঝে দম নিতে হচ্ছিল এবং কথা আটকে যাচ্ছিল।

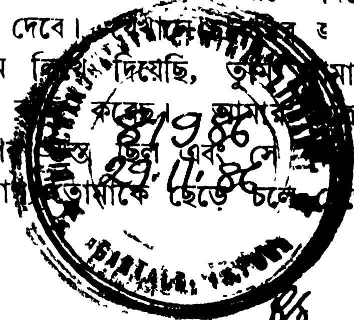
—বাবু, আমি যেতে পারছি না, কিন্তু দাদাবাবুর যদি কোন দরকার হয়, আমাকে খবর দিতে দেরি করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব।

ভগবানবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—সে কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ভগবানবাবু আবার কথা বললেন—আমি চলে যাবার পর তুমি কি করবে?

গামছার খুঁট আঙুলের ডগায় পাকাতে পাকাতে মাধব উত্তর দিল—আপনি যা বলবেন।

ভগবানবাবু টেবিলের ওপর থেকে খামটি নিয়ে মাধবের হাতে দিয়ে বললেন—এই খামটা তুমি খুব সযত্নে রেখে দেবে। যেখানে [illegible] যাবে, এই খামটা দেখাবে। এতে আমি লিখে দিয়েছি, তুমি [illegible] আমার বাড়িতে দীর্ঘদিন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে [illegible] করেছ। আমার [illegible] জীবনমৃত্যুর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তোমার ওপর [illegible] ছিল এবং সে [illegible] পরিপূর্ণভাবে পালন করেছ। আমার দুর্ভাগ্য তোমাকে ছেড়ে চলে [illegible]



হচ্ছে ; তুমি যার কাছেই কাজ করবে, তুমি তার একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-রূপে প্রমাণিত হবে।

মাধব কোন কথা শুনছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু অঝোরভাবে শিশুর মত কাঁদছিল। হাকিম সাহেবও ঠিক সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই সংক্ষেপে বললেন—জগদীশচন্দ্রও খুব কান্নাকাটি করছে। তুমি যদি এভাবে কান্নাকাটি কর, ও তাহলে একেবারে ভেঙে পড়বে। তুমি শান্ত হও। আমি এদিকে কোন কারণে এলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব।

মাধব অনেকটা শান্ত হল। ভগবানবাবু ধীরকণ্ঠে আবার বললেন—জগদীশের মাতাঠাকুরানী তোমাকে এক বছরের মাইনে দিয়েছেন। যে ক' দিন কাজ না পাও, এ দিয়ে সংসার চালিও। আশা করি এক বছরের মধ্যে চাকরি পেয়ে যাবে।

একটি থলি-ভরতি টাকা মাধবের হাতে দিয়ে ভগবানবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাধব খাম আর টাকার থলি হাতে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বালক জগদীশ। তার দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

মাধব ছুটে গিয়ে জগদীশচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। জগদীশচন্দ্রও দুর্ধর্ষ ডাকাতের ক্ষতচিহ্ন আঁকা চওড়া বুকের ওপর মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে সারা বুক ভিজিয়ে দিল, একটি কথাও বলতে পারল না।

॥ তিন ॥

দারুণ নির্জনে

শহর কলকাতার রূপ তখন অন্যরকম। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে যে চওড়া রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা গড়ের মাঠের মাঝামাঝি গিয়ে পুব দিকে বেঁকে শহরের শেষ প্রান্তে শেষ হয়েছে। এই রাস্তার পূর্বপ্রান্তে কবরস্থান। শহরের কোন ইংরেজ মারা গেলে এই কবরস্থানে কবর দেওয়া হত। গড়ের মাঠের পূর্বপ্রান্ত থেকে শহরের পূর্বপ্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত যে সদর রাস্তাটা চলে গিয়েছে সাহেবরা তার নাম দিয়েছেন পার্ক স্ট্রীট।

পার্ক স্ট্রীটের মাঝ বরাবর দক্ষিণ দিকে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। সেণ্ট জেভিয়ার্স ছিলেন মহান পাদ্রী, যিনি ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরই স্মৃতির সম্মানে গড়ে উঠেছে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে একটি ফিটন গাড়ি চলেছে। যাত্রী দুজন। পিতা এবং পুত্র। ভগবানচন্দ্র এবং জগদীশ। দুজনেই নীরব। পিতা ভগবানচন্দ্র পুত্র জগদীশকে নিয়ে চলেছেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্যে। ছেলেকে তিনি উচ্চশিক্ষিত করবেন, যতদিন তাঁর ক্ষমতা থাকবে, যতদূর তাঁর ছেলে পড়তে চাইবে, ততদূর তিনি বিনা দ্বিধায় পড়িয়ে যাবেন। সন্তানকে মানুষ করতে হলে নিঃসন্দেহে আগে তাকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে হয়। শিক্ষা না থাকলে নিজের উন্নতি কি করে করবে? করতে পারবে না? নিজের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশের উন্নতি করতে হলে নিজেকে তৈরী করতে হয় দারুণ নির্জনে, তারপর নিজে তৈরী হয়ে গেলে অন্যকে তৈরী হবার আদেশ দিতে হয়, আর তখনই সে আদেশ সকলে শোনে।

ভগবানবাবু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা। ছেলের জন্যে নয়, নিজের জন্যে। ছেলে যে সোনার টুকরো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাঁর। বর্ধমানে যেদিন জগদীশ পুরনো বাসনের টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে ছোট্ট একটা কামান তৈরী করেছিল, সেইদিনই তিনি অনুভব করেছিলেন, ছেলেকে বিজ্ঞান পড়তে দিলে ভবিষ্যতে সে খেলার কামানের মতই অনেক অভিনব সামগ্রী তৈরী করতে পারবে।

চিন্তা সেখানে নয়, চিন্তা অন্যত্র। ভগবানবাবু ফরিদপুর থেকে বর্ধমানে অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারের পদে বদলি হয়ে এলেন আঠারশো উনসত্তর খ্রীষ্টাব্দে। ভগবানবাবু কৃতী অফিসার। অতি অল্পকালের মধ্যেই কাজে সুনাম রটে গেল। জগদীশও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করত এবং যদি কোন প্রশ্ন মাথায় আসে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করত না।

যে প্রশ্নটি অহরহ কিশোর জগদীশের মাথায় ঘুরে বেড়াত, সেই প্রশ্নই সুযোগ পেলেই পুত্র, পিতাকে করে বসত। পুত্রের প্রশ্ন যতই অবোধ্য হোক, অযৌক্তিক হোক, হাস্যকর হোক, পিতা কখনই নিরুৎসাহ করেন নি, ভৎর্সনা করেন নি বিরূপ হন নি। হাসি মুখে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন।

একদিন জগদীশ প্রশ্ন করে বসলেন—আচ্ছা বাবা! আপনি বললেন, মুনি ঋষিরা বলতেন গাছের প্রাণ আছে—

ভগবানবাবু তাঁর উক্তিকে জোরালো করার জন্যে জোরের সঙ্গে বলতেন—শুধু বলতেন নয়, তাঁদের বিশ্বাস ছিল গাছের প্রাণ আছে।

—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না—

—বল ?

—লজ্জাবতী আর বনচাঁড়াল গাছের পাতা ছুঁয়ে দিলে নুয়ে পড়ে, কিন্তু আম, জাম, কাঁঠাল—এসব গাছের পাতা ছুঁলে তো নুয়ে পড়ে না।

ভগবানবাবু প্রশ্নটি শুনলেন। গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—আমার মনে হয় সব গাছই সাড়া দেয়। আমরা সে সাড়া বুঝতে পারি না। সব মানুষই কথা বলে। সব পশুপাখি ডাকে। সব মানুষের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না—বুঝি লোকটা কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কি বলতে চাইছে বুঝতে পারি না। পশুপাখিদের বেলায় আরও বুঝতে পারি না, তেমনি গাছগাছড়ারও ভাষা আছে, কিন্তু সে ভাষা আমরা বুঝতে পারি না বলেই সব ব্যাপারটা মানুষের কাছে হেঁয়ালীর মত লাগে।

জগদীশ বাবার কথা শুনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা পুত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, মনে মনে বুঝতে পারলেন, তার সবটা জগদীশ মেনে নিতে পারে নি। বাবা একটুও রাগ করলেন না, একটুও বিরক্ত হলেন না; স্মিতমুখে বললেন—আমার কথা তুমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছ না। বেশ, আরও সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। দেখ, মানুষকে বা কোন প্রাণীকে যদি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত কর আঘাতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়বে। এ কথা মানো?

জগদীশ হাসতে হাসতে উত্তর দিল—নিশ্চয়ই মানি।

—ভাল কথা। আম, শজনে, জিবলী ধরনের গাছে ধারালো দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দাও, দেখবে গাছের গা বেয়ে কষ বেরোচ্ছে। কে বলতে পারে আমাদের যেমন রক্ত ঝরে, ওদেরও তেমনি কষের মত রক্ত ঝরছে কিনা?

জগদীশের বুকের মধ্যে থরথরানি। আশ্চর্য অনুভূতি। পিতৃদেব যেন তার চোখের ওপর এক অজানা জীবনের পর্দা সরিয়ে দিয়ে নতুন এক জগতে উপস্থিত করলেন। সে যেন শুনতে পেল বহুদূর থেকে তার পিতা বলছেন—আমরা, হিন্দুরা মুনি ঋষিদের কথা খুব মানি। আমরা তাকে ধর্ম বলি। আমাদের ধর্মে আছে যে গাছে ফল-ফুল দেয়, সে গাছ কখন কেটো না।

জগদীশের মন মুহূর্তমধ্যে আলোকিত, আনন্দিত, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে যে উত্তর খুঁজছিল সে উত্তর পেয়ে গেছে যেন।

পিতা কিন্তু একটুও বিব্রত নন! কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভগবানবাবু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে বসলেই জগদীশ পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মনের প্রশ্নের পাহাড় উজাড় করে ঢেলে দিত বাবার সামনে—

—বড় মাছ কেন ছোট মাছ খেয়ে ফেলে?

—ইলিশ মাছ পাড়ে বেশীক্ষণ বাঁচে না কেন?

—মাছের গা অত চকচক করে কেন?

হাজার হাজার প্রশ্ন। হাজার হাজার উত্তর। পুত্র যে উৎসাহ নিয়ে

পিতাকে প্রশ্ন করে, পিতা তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ নিয়ে উত্তর দিতে থাকেন। একদিনও ক্লান্ত হন নি, একদিনও বিরক্ত হননি। একদিনও অবসন্ন হয়ে পড়েন নি।

চিন্তা সেজন্য নয়। চিন্তা অন্য কারণে। তিনি যখন বর্ধমানে কাজে যোগদান করেছিলেন, তখন বর্ধমানের আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণভাবে দেখা দিল। দেখতে দেখতে বর্ধমান জেলার পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে হাজার হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। ভগবানচন্দ্র প্রাণপণে এই অবস্থার সম্মুখীন হলেন। যেভাবে হোক দেশের এই মড়ক রোধ করতে হবে। নিজের বাড়িতে পথ্য তৈরীর কেন্দ্র খুললেন। ওষুধ পথ্য যাতে অবিলম্বে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করলেন। গ্রাম গ্রামান্তরে কখনও একা, কখনও সহকারীদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন রোগীর সেবায়, নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দেবার মানসে।

তাঁর অদম্য চেষ্টায় রোগের প্রকোপ কমল বটে, কিন্তু নিজের শরীর ভেঙে গেল। আগের মত উৎসাহে আর তিনি তেমনভাবে কাজ করতে পারেন না, এখন শুধু চিন্তা তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে যেন ছেলেকে মানুষ করে যেতে পারেন।

সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুল প্রাঙ্গণে এসে ফিটন দাঁড়াল। ভগবানচন্দ্র আগে গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর হাত ধরে জগদীশকে নামালেন। কলকাতা জগদীশের কাছে নতুন নয়, কারণ হেয়ার স্কুলেও সে পড়েছে, যদিও খুব অল্প দিনের জন্যে, মাত্র তিন মাসের মত। সেণ্ট জেভিয়ার্সে নেমে জগদীশের কেমন অস্বস্তি লাগল। যে সব ছাত্ররা যাতায়াত করছে. তারা সকলেই কেতাদুরস্ত সাহেব। কোট প্যাণ্ট টাই বো হ্যাট, ফেল্ট ক্যাপ। এ পরিস্থিতি, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা জগদীশচন্দ্রের একেবারে অপরিচিত। এতকাল সে গ্রামেই পড়াশুনা করেছে। মাত্র তিন মাসের জন্যে হেয়ার স্কুলে পড়েছে, তারপরই এই সাহেবী স্কুলে। পারবে তো সে? ইংরিজী কথা বলতেই জানে না সে, একটু আধটু পড়তে পারে, আর চারিদিকে ছেলেরা ফটাফট ইংরিজীতে কথাবার্তা বলছে, তার একটি কথাও বুঝতে পারছে না।

মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে, নিঃশব্দে বাবাকে অনুসরণ করে ভর্তি হবার ঘরে উপস্থিত হল জগদীশ। প্রাথমিক কথাবার্তার পর মিশনারী শিক্ষক খুশি হয়ে একখানি ভর্তির ফর্ম জগদীশচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—ফিল দিস্ ফর্ম।

জগদীশ মনোযোগ সহকারে ফর্মটি পড়ে দেখল, তার পর ধীর স্থিরভাবে ভর্তি করতে লাগল—নাম—জগদীশচন্দ্র বসু,

জন্ম তারিখ ও সাল—৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮,

পিতার নাম—ভগবানচন্দ্র বসু,
জন্মস্থান—রাঢ়িখাল, বিক্রমপুর, ঢাকা বঙ্গদেশ।

সে যুগের বঙ্গদেশ এক স্বর্ণযুগ। পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া। প্রতি পাতায়, প্রতি শিরায় চঞ্চলতার মাদকতা। জীবনের স্পন্দন প্রতি ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের খ্যাতি তখন মধ্যাহ্ন গগনে। মেঘনাদবধ কাব্য প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার হাতে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন বাংলাদেশের কবি মিলটন।

মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান সাদরদাঁড়ির সন্নিকটস্থ কপোতাক্ষী নদীর তীরে রাড়ুলি গাঁ থেকে বাংলাদেশের আর এক কৃতী বৈজ্ঞানিক কলকাতার হেয়ার স্কুলে তার বাবার সঙ্গে ভর্তি হতে আসেন। এই কৃতীপুরুষ ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। যশোহর জেলায় পালোয়া মাগুরায় জন্মেছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ।

যশোহর জেলার কৃতী-সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বাবার হাত ধরে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়ালেন হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে। পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের আশ্চর্য দক্ষতা ছিল ইংরিজী ভাষার ওপর এবং প্রফুল্লচন্দ্রকে ইংরিজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যই কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করার জন্য এসেছেন। যদিও সিপাই-বিদ্রোহ অল্প কয়েক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ বর্তমান, তবু হরিশ্চন্দ্রবাবু মনেপ্রাণে অনুধাবন করেছিলেন ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরিজী প্রথায় শিক্ষা দিতে হবে। এখানে শিক্ষা ভালভাবে সমাপ্ত হলে, বিলেতে পাঠাতে হবে। পশ্চিম দেশের মানুষ যতক্ষণ না স্বীকৃতি দেন, ততক্ষণ দেশের মানুষ সেই শিক্ষাকে স্বীকার করতে চায় না। হরিশ্চন্দ্রবাবু বিলক্ষণ জানতেন ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে পাঠানোর অর্থ দেশের সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়া। দেশের সমাজ তাঁর পরিবারকে ম্লেচ্ছ বলে, পতিত করে একঘরে করবে। তবু—তবু তিনি সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করবেন।

১৮৭০ সালে ব্রাহ্মসমাজের কাছেই ১৩২ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে হরিশ্চন্দ্রবাবু পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র পরের বছর দাদা নলিনীকান্তর সঙ্গে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হল। বড়দাদা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ছে। প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে যাতায়াত করে আর আশ্চর্য মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করে। প্রফুল্লর মেধা শুধু পড়াশুনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, যেখানে যা ভাল দেখত বা শুনত, তারই প্রতি আকৃষ্ট হত প্রফুল্লচন্দ্র। হেয়ার স্কুলে তখন মাস্টারমশাই ছিলেন গিরীশচন্দ্র দেব, প্যারীচরণ সরকার, নীলমণি চক্রবর্তী—আরও অনেকে। এঁদের পড়ানো

অবাক হয়ে প্রফুল্ল শুনত আর ভাবত জীবনে কত শিখতে হবে, কত জানতে হবে, জানার বা শেখার কিছুই শুরু হয়নি এখনো।

হেয়ার স্কুল তখন ভবানীচরণ দত্ত লেনের একটি বাড়িতে। ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ার জন্য ১৮৭২ সালে বর্তমান স্থানে হেয়ার স্কুল স্থানান্তরিত করা হয়।

হরিশ্চন্দ্রবাবু ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। কখনও শাসন করতেন না, ছেলেও কখনও বিপথে যায় নি। প্রফুল্লচন্দ্রও বাবার সঙ্গে নানা সভায় যেত। ছোটবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতা শুনে ভাল ভাল লেখা পড়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। সে লেখাপড়ার পর, সন্ধ্যেবেলায় ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হত এইসব মনিষীদের বক্তৃতা শোনার জন্যে।

১৮৭৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্র অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর রকমের রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বহুদিন শয্যাগত হয়ে থাকার জন্য স্কুলে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শহর কলকাতার ছেলেরা প্রফুল্লকে স্কুলে বাঙাল বলে ক্ষেপিয়েছে, দেখতে ভাল নয় বলে উত্ত্যক্ত করেছে, কিন্তু কেউ তাকে পড়াশুনা থেকে এক বিন্দু টলাতে পারে নি। সেই ছিপছিপে ইস্পাতের তৈরী ছেলেটিকে একেবারে কাবু করে দিল রক্ত আমাশয় রোগ। সে বিছানা থেকে উঠতে পারল না দীর্ঘদিন। স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং হেয়ার স্কুল থেকে নাম মুছে গেল।

দু বছর পরে আবার স্কুলে ভর্তি হল প্রফুল্লচন্দ্র। শরীর কিন্তু আর ভাল হল না। সেই ভয়াবহ রক্তামাশয় প্রফুল্লচন্দ্রকে চিররুগ্ন করে দিয়ে গেল।

এবার কিন্তু হেয়ার স্কুলে নয়। কেশব সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যালবার্ট স্কুল। প্রফুল্লচন্দ্র অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হল। সেই সময়ে অ্যালবার্ট স্কুলের রেক্টর ছিলেন কেশব সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু আশ্চর্য সুন্দর পড়াতেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রফুল্ল সকলের প্রিয় হয়ে উঠল।

পরের বছর প্রফুল্ল আবার হেয়ার স্কুলে যাবে ঠিক হল। প্রত্যেক বছর অ্যালবার্ট স্কুলে প্রফুল্ল ফার্স্ট হয় এবং যথারীতি ফার্স্ট প্রাইজ পায়।

যেদিন হরিশ্চন্দ্রবাবু প্রফুল্লকে ডেকে বললেন—"আসছে বছর তুমি আবার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবে—" সেদিন প্রফুল্লের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। আলবার্ট স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আর কয়েক মাস দেরি আছে। পরীক্ষা দিলে সে নিশ্চিত প্রথম স্থান অধিকার করবে, এ সম্পর্কে তার কোন দ্বিধা নেই। প্রফুল্লচন্দ্র বাবার কথায় কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় নেই। একেবারে দেশের বাড়িতে। আলবার্ট স্কুলে

ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়েই দেশে চলে গেল এবং সেখানেই পড়াশুনা করতে লাগল।

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এল। নিঃশব্দ পায়ে, হেঁট মাথায় প্রফুল্ল অ্যালবার্ট স্কুলের অফিসের দরজায় হাজির হল। অফিস ঘরে বসেছিলেন শিক্ষক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। প্রফুল্লকে দেখে সকলেই খানিকটা অবাক হয়ে গেলেন। কালীপ্রসন্নবাবু প্রফুল্লকে ঘরের মধ্যে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

—দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।

—কেন? হঠাৎ পরীক্ষার আগে দেশে চলে গেলে কেন?

—বাবা বললেন, এ বছর আমি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হব—তাই—।

—আরে ভর্তি হবে তো পরীক্ষার পর পাস করলে। তার জন্যে পরীক্ষা না দেবার কারণ কি থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না।

প্রফুল্ল যেন লজ্জায় মিশে গেল। সে প্রথমটা কোন কথাই বলতে পারল না, তারপর একটু একটু করে বলতে লাগল—পরীক্ষা দিতে আমার খুব লজ্জা করছিল। নিজেকে চোর চোর মনে হচ্ছিল—

—এসব কি বলছ তুমি? কালীপ্রসন্নবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—পরীক্ষা দিতে লজ্জা করবে কেন? নিজেকে চোর বলেই বা মনে করবে কেন?

প্রফুল্লচন্দ্র সকলকে অবাক করে দিয়ে কালীপ্রসন্নবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলতে লাগল—স্যার আপনাদের আশীর্বাদে আমি পরীক্ষায় বসলে ফার্স্ট হতাম, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রাইজটা নিয়েই আমি অন্য স্কুলে পালিয়ে যাব, এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। নিজেকে চোর ঠগ মনে হচ্ছিল। তাই ঠিক করলাম, এ স্কুলে যে বরাবর থাকবে সেই পরীক্ষা দিক, ফার্স্ট হোক, প্রাইজ পাক। এ প্রাইজ আমার পাওয়া উচিত নয়। এই ভেবে আমি পালিয়ে গেলাম দেশের বাড়িতে।

প্রফুল্ল চুপ করল। অফিস ঘর নিস্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। প্রফুল্ল আবার সকলকে প্রণাম করে বলল—পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার আমি ট্রান্সফার নিতে এসেছি। হেয়ার স্কুলে পরীক্ষা দেব। যে ক্লাসের পরীক্ষায় পাস করব, সেই ক্লাসে ভর্তি হব।

প্রফুল্ল চুপ করল। অফিস রুমে কেউ কোন কথা বলছেন না। নিস্তব্ধ। একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে।

—আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব প্রফুল্ল। কালীপ্রসন্নবাবু গম্ভীর-কণ্ঠে বললেন—তোমাকে আমরা হেয়ার স্কুলে যেতে দেব না। তুমি আমাদের এখানেই পড়বে। এখান থেকে পাস করে কলেজে ভর্তি হবে।

কালীপ্রসন্নবাবু সেইদিন বিকেলবেলায় হরিশ্চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে

বুঝিয়ে দিলেন প্রফুল্লকে তার হাতে তুলে দিলে, তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে ছেলেকে পড়াবেন। মানুষ করে দেবেন।

মাস্টারমশায়ের সেই আকুতি ফিরিয়ে দিতে পারেন নি ছাত্রের পিতা। সেই ছাত্রটি তারপর অ্যালবার্ট স্কুলেই পড়াশুনা করেছে।

অতিরিক্ত কান্নার তোড়ে অবশেষে বালক রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্বাভাবিক বয়সের চেয়ে একটু কম বয়সেই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল, কারণ ভর্তি না হওয়ার জন্য বালকের কান্না কিছুতেই থামে না। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বালক না বলে শিশু আখ্যা দিলেই বোধহয় ঠিক হয়। শিশুর দাদা এবং বয়সে বড় ভাগনে সত্য যেদিন স্কুলে ভর্তি হল, সেদিন শিশুও স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে বায়না ধরল; শিশু তার আগে কোনদিন বাড়ির বাইরে যায় নি, কোনদিন গাড়িতে চড়ে নি। তার খেলার সাথীরা এমনভাবে স্কুলে ভর্তি হচ্ছে দেখে কান্নার স্রোতে সব ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করল।

শিশু রবির গৃহশিক্ষক অনেকক্ষণ বোঝাবার চেস্টা করলেন, কিন্তু হার মানতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত কান্না থামানোর অভিপ্রায়ে এবং শিশুর মোহ বিনাশ করার জন্য প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মেরে মাস্টারমশায় বললেন—"এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিতে হইবে।"

কান্নার জোরে শিশু অকালেই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হল। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুসুলভ ভাবুক মন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল এই ইস্কুলে পড়া না পারলে এক বিচিত্র পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হয়। যে ছেলে পড়া বলতে পারে না, তাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে হাত দুটিকে দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে সোজা করে রাখবার হুকুম দিতেন মাস্টারমশায়। ছেলেটি হুকুম তামিল করলে তার সেই প্রসারিত হাতের ওপর বই, খাতা শ্লেট চাপিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত! বালক রবি অবাক বিস্ময়ে ভাবত, বই-খাতার পড়াগুলো প্রসারিত হাতের ওপর চাপিয়ে দিলে কি করে সেই পড়া বইয়ের মধ্য থেকে হাতের ভেতর দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে? বালক অবাক বিস্ময়ে ভাবত, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারত না। সাহস ভরে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পেত না।

এমনিভাবেই নিতান্ত শিশুবয়সেই তার লেখাপড়ার সূচনা হল।

সেদিন মেঘলা অপরাহ্ন। শিশুবয়সের ভাবুক মন নিয়ে, সে রাস্তার ধারে লম্বা বারান্দার ওপর খেলা করছিল। বালকের বিচিত্র মনে পুলিসম্যান সম্পর্কে এক ভয়াবহ কাল্পনিক ধারণা ছিল। সে ভাবত পুলিসম্যানের হাতে যদি কোন মানুষকে অপরাধী বলে তুলে দেওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে, কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করে জলের তলে অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক তেমনি

করে হতভাগ্য অপরাধীকে চেপে ধরে পুলিসম্যান অতল-স্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এই রকম শিশুসুলভ ভীতিকে সেদিন সত্য ভাগনে চমকে দিয়ে গেল খানিকটা মজা দেখার জন্যে। সে হঠাৎ পুলিসম্যান বলে চিৎকার শুরু করে দিল। বালক হঠাৎ ভাবল তাকে ধরতেই বোধহয় পুলিসম্যান আসছে। সে কোনদিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্দরমহলে মায়ের কাছে হাজির হয়ে পুলিসম্যানের কথা বলল। মা কিন্তু এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে একটুও চিন্তিত না হয়ে, আপন কাজ আগের মতই করতে লাগলেন। শিশু মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে, এক ছুটে দিদিমার কাছে গিয়ে তাঁর হাত থেকে রামায়ণ নিয়ে নিজে সুর করে পড়তে লাগল। রামায়ণ পাঠের মধ্যে শিশু কখন যে পুলিসম্যানের কথা ভুলে গেছে, নিজেও জানে না। রামায়ণের আবেগময় অধ্যায় পাঠ করতে করতে তার দুগাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল আর সেই দূর সম্পর্কের দিদিমা রবির হাত থেকে রামায়ণ কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

বালকের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বললেই হয়। বালকেরা চাকরদের অধীনে থাকত। চাকরেরা কাজ কম করতে হবে বলে এদের দিকে নজর দিত না, ফলে প্রায় অনাদরেই শিশুকাল বেড়ে উঠেছিল। পোশাক যৎসামান্য ছিল, দশ বছরের আগে বালক কোন দিন মোজা পরে নি। "শীতের দিনে একটা সাদা জামার ওপরে আর একটা জামাই যথেষ্ট ছিল।" কিন্তু তাতেও বালকের কোন ক্ষোভ ছিল না, শুধু দুঃখ হত তখনই, যখন বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করে, ইচ্ছে করে জামায় পকেট লাগিয়ে দিত না।

বাহিরবাড়ির দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে বালকের দিন কাটত। রবির এক চাকর ছিল, তার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা অল্পবয়সী চাকর, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় শ্যামের বাড়ি। সে বালককে ঘরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে রেখে, তার চারদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি এঁকে দিত। সে গম্ভীর মুখে আঙুল তুলে বলত—গণ্ডির বাইরে গেলেই কিন্তু বিষম বিপদ।

বালকের মন ছমছম্ করত। কিন্তু কি ধরনের বিপদ হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান না থাকলেও, বিপদ যে হতে পারে, এ সম্পর্কে প্রায় সে নিশ্চিত। রামায়ণে গণ্ডি পার হয়ে সীতার কী সর্বনাশ হয়েছিল, এ কাহিনী বালক তখন ভালভাবেই জানে, কারণ সে তখন নিয়মিত রামায়ণ পাঠে অভ্যস্ত। সেই গণ্ডিকে বালকের ভাবালু মন নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়িয়ে দিতে পারত না, এবং চুপচাপ বসে থাকত।

বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল বালকের। এমন কি বাড়ির ভিতরেও সর্বত্র যেমন খুশী যাওয়া-আসা করতে পারত না। এই নিষেধের বেড়াজাল

থাকার জন্যেই বোধ হয় বালকের মনে এক আশ্চর্য রহস্যময় অনুপ্রেরণা গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে বালকের মন ভাবালু কবিমনে রূপান্তরিত হয়ে উঠছিল।

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণে বেড়াতেন। বাড়ি থাকতেন না। তাঁর তেতলার ঘর বন্ধ থাকত। বালক রবি সকলের অজান্তে সেই ঘরের সামনে উপস্থিত হয়ে খড়খড়ি খুলে, হাত গলিয়ে ছিটকিনি টেনে দরজা খুলে ফেলত, তারপর ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে বাবার যে সোফাটি ছিল, তার ওপর চুপ করে বসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে দিত। অনেকদিনের বন্ধ ঘর, প্রবেশ নিষেধ, দুপুরের ঝাঁঝাঁ রোদ, জনশূন্য রাস্তা, সব মিলিয়ে বালকের মনে এক আশ্চর্য রহস্যময় অনুভূতি সৃষ্টি করত। বালক মাঝে মাঝে বাবার কলঘরে গিয়ে ঝাঁঝরা লাগানো কলে স্নান করে মনের সাধ মেটাতো। স্নান করার জন্যে যত না আনন্দ, লাগাম-ছাড়া মন জলের ধারার সঙ্গে বহুদূরে প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে যেত, হারিয়ে যেত, তাতেই বেশী আনন্দ।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বেশীদিন ছিল না। তারপর বালক রবি নর্মাল স্কুলে ভর্তি হল। এখন একটু বয়স হয়েছে। শিশুসুলভ কল্পনার সঙ্গে বালকের মনে এখন অনেক সূক্ষ্মবোধের জন্ম হয়েছে। বালক অনেকদিন ভেবেছে স্কুল শুরু হবার আগে যে প্রার্থনা সঙ্গীত সুর করে মন্ত্রের মত গাওয়া হয়, সেটা কী? কথাগুলোই বা কী? অর্থই বা কী? বালক বহুদিন ভেবেছে, ভেবে ভেবে সে লাইনের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারে নি, তবে কথাগুলো যে কী সে সম্পর্কে খানিকটা মনে আছে। কথাগুলো হলঃ কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি থেকে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়ে বালক রবি অন্যান্য বালকের মতই স্কুলে যাতায়াত শুরু করল, কিন্তু স্কুলের পরিবেশ তার ভাল লাগল না। শিক্ষকরা কুৎসিত কথা বলতেন। একজন এত কুৎসিত কথা বলতেন, যে তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে গেলেই বালক কেমন নিশ্চুপ হয়ে যেত, মুখ দিয়ে কথা বার হত না। উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হত না। সারা বছর সমস্ত ছেলের পেছনে নিঃশব্দে বসে থাকত বালক।

এমনিভাবে এক বছর শেষ হয়ে গেল। বাৎসরিক পরীক্ষা এল। মধুসূদন বাচস্পতি পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। বালকটি সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হল। বালক রবির ক্লাস-টিচার কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে বললেন পরীক্ষক ওর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যে ছেলে সারা বছর একটিও পড়া বলতে পারে নি, সে কি করে সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়?

আবার পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। বালক হাসিমুখে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিল। এবার স্বয়ং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি নিয়ে বসলেন। এবারেও কিন্তু সেই বালক পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করল।

বালকের মনে ক্রমশ কবিত্বের উন্মেষ। মনের আকাশে প্রভাতসূর্যের প্রথম প্রকাশ। রবিকরে পূর্বাকাশ আরক্ত—আনন্দিত।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো ভাগ্নে শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ, ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করে, হ্যামলেট থেকে নানা পংক্তি আবৃত্তি করে শোনাতেন। তিনি হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় রবীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন—তোমাকে পদ্য লিখতে হবে। তারপরে ভাগনে মামাকে পয়ার ছন্দ নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের দাদা কোন শ্রোতা পেলেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার কথা বলতেন এবং কবিতা পাঠ করিয়ে শোনাতেন। একদিন 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় সবে মাত্র ঠাকুরবাড়িতে পদার্পণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দাদা তাঁকে গ্রেফতার করে বললেন—"নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না।"

রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠ করল। নবগোপালবাবু কবিতা শুনলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন—"বেশ হইয়াছে, কিন্তু ওই 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই দ্বিরেফ কথাটি খুঁজে খুঁজে বার করে লিখেছিল। বালকের কঠিন কথা খুঁজে বার করার যে প্রবণতা ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবি 'ভ্রমর' কথার বদলে 'দ্বিরেফ' কথা ব্যবহার করেছিল, কিন্তু কোত্থেকে এই 'দ্বিরেফ' কথা বালক বয়সে সংগ্রহ করেছিল, বিশ্বের মহাকবি হবার পরও তিনি তা মনে করতে পারেন নি, আবিষ্কার করতে পারেন নি।

নর্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি ছেলেদের প্রায় সমস্ত বিষয়েই পড়াতেন। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত পড়াতেন। সন্ধ্যের সময় ইংরিজী পড়াবার জন্য অঘোরবাবু আসতেন। রবিবারে বিষ্ণুর কাছে গান শিখতে হত।

সাতকড়ি দত্ত যদিও রবীন্দ্রনাথের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না, তবুও তিনি রবীন্দ্রনাথকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক ?"

রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার না করে অকপটেই ব্যক্ত করেছিল। সাতকড়িবাবু রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করার জন্যে দুই একপদ কবিতা দিয়ে পূরণ করতে বলতেন, এবং বালক রবীন্দ্রনাথও তা অনায়াসে পূরণ করে দিত।

রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু ছিলেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। বেঁটেখাটো, মোটাসোটা, কালো রং। কালো চাপকান পরে দোতলায় অফিসঘরে বসে কাজকর্ম করতেন। রবীন্দ্রনাথ এঁকে ভয় করত।

একদিন ছুটির সময় গোবিন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ ভীতচিত্তে তাঁর সামনে দাঁড়াতে, তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি নাকি কবিতা লেখ?"

রবীন্দ্রনাথের উত্তর—হ্যাঁ।

—কাল একটা কবিতা লিখে আনবে।

রবীন্দ্রনাথ আদেশ শুনে নির্বাক, কিন্তু পরদিন একটা কবিতা লিখে যখন মাস্টারমশায়কে দেখাল, তিনি সবটা পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে বললেন—এসো, আমার সঙ্গে।

নির্বাক রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দবাবুর সঙ্গে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাস্টারমশায় রবির দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন—"পড়িয়া শোনাও।"

রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে কবিতা পাঠ শুরু করল। ছেলেরা কবিতা শুনে রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসা না করে, বরং বক্রোক্তি করল। অধিকাংশ ছেলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এ লেখা নিশ্চয়ই কারুর লেখা থেকে চুরি করা। এ কখনই ওর নিজের নয়। দু' একজন এ কথাও বলল—"যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি, সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে।"

এমনিভাবে একই সময়ে কলকাতা শহরে ঠাকুরবাড়ির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং ঠাকুরবাড়ির বাইরে শহরের বুকে জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রের মত বিজ্ঞানীর বিকাশ দারুণ নির্জনে উদ্ভাসিত, উদ্বেলিত, চঞ্চলিত হতে শুরু করল।

॥ চার ॥

অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ।

জগদীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই ভর্তি হল। জগদীশচন্দ্র অতি সাধারণ ছাত্র। গ্রাম্য ছাত্র। ইংরিজীতেও খুব চোস্ত নয়, তাই অন্যান্য শহুরে ছেলেদের সঙ্গে তেমন পাল্লা দিয়ে উঠতে পারত না। ক্লাসের পেছন দিকে একটি বেঞ্চের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকত জগদীশচন্দ্র।

কলেজে ঢুকেই যেন তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটল। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ফাদার লাফোঁ। তিনি আশ্চর্যভাবে বিজ্ঞানের বিষয় বক্তৃতা দিতেন। বিজ্ঞানের বিষয়, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার মত কঠিন বিষয় ফাদার লাফোঁর বক্তৃতায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। গ্রামের ছেলে জগদীশচন্দ্র, লাজুক ছেলে জগদীশচন্দ্র এতোদিন যে ছেলে ভালো করে কথা বলতে পারত না, সে লাফোঁর বক্তৃতা শুনে সোজা হয়ে বসত। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আনন্দ বিস্ময়ে থিরথির করে কেঁপে উঠত। লাফোঁ যখন পদার্থবিদ্যার সমস্যাগুলো ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষা করে দেখাতেন, তখন প্রত্যেক ছাত্রই মুগ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু জগদীশচন্দ্র স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে কত কী যে ভাবত, নিজেই জানে না।

কিশোর জগদীশচন্দ্র ক্রমশ যৌবনে পদার্পণ করলেন। উত্তরজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙীন স্বপ্নের জাল সবে বুনতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় ভাগ্যের ঝঞ্ঝায় সমস্ত জীবনপথ যেন অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন হয়ে গেল।

১৮৭৭ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করলেন।

সারা জীবন যে লোকটি সম্রাটের মত উদার হৃদয় নিয়ে কাটিয়েছেন, তাঁর জীবনে নেমে এল নানা দিকের দুর্যোগ। ভগবানচন্দ্র আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিশ্বাস করে, তাঁদের প্ররোচনায় সারাজীবনের অর্জিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটালেন। আসামের তরাই অঞ্চলে ছ' হাজার বিঘে চায়ের বাগান কিনলেন।

কিন্তু সে বাগানগুলো একেবারে অর্থহীন। চা-পাতা হয়ও না, যেটুকু হয়, তাতে বিক্রি হলেও কোন লাভ হবার প্রশ্নই থাকে না। এর মধ্যে কিছু বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে তিনি পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সকলের চেয়ে বেশী শেয়ার তাঁর নামেই কিনলেন। কতকগুলো শিল্প ও

কৃষিজাত প্রতিষ্ঠান ভগবানবাবু গড়ে তুললেন। আশা ছিল, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ঘটাবেন। কিন্তু হায়! তাঁর সমস্ত স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল। সব ব্যবসায় ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হল। সমস্ত ঋণের ভার জগদীশচন্দ্রের পিতার ওপর চেপে বসল। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভগবানচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং রুগ্ন অবস্থায় শয্যা নিলেন। বহুদিন কাজে যোগদান করতে না পারায় মাইনেও কাটা যেতে লাগল, ফলে সাংসারিক অর্থকষ্ট এমন এক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াল যে দৈনন্দিন অন্নসংস্থানই একটি সমস্যা হয়ে গেল, ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া তো কল্পনার বাইরে।

বি. এ. পাস করার পর জগদীশচন্দ্রের একমাত্র চিন্তা বাবাকে কীভাবে ঋণমুক্ত করা যায়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সমস্ত সংসার না খেয়ে মারা যাবে। শুধু ঋণ নয়, যে টাকা ঋণ হয়েছে, তার সুদ বাবদ প্রতি মাসে যে মোটা টাকা বেরিয়ে যায়, তাতে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

জগদীশচন্দ্র রুগ্ন শয্যাগত পিতার কাছে গিয়ে বললেন—বাবা, আমি বি. এ. পাস করেছি।

তারপর মা এবং বাবাকে প্রণাম করলেন। বাবা আশীর্বাদ করে বললেন —এবার, তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

—ভাবাছ। জগদীশচন্দ্র একটু নীরব থেকে বললেন—বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেব।

এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন ভগবানচন্দ্র। ছেলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দেশে ফিরে মোটা মাইনের সরকারী চাকরি পাবে; তখন অনায়াসে পিতৃঋণ শোধ ও সংসার প্রতিপালন সম্ভব হবে।

—না। রুগ্ন অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ভগবানচন্দ্র উত্তর দিলেন।

--তুমি বিলেতে গিয়ে বিজ্ঞান পড়বে।

রুগ্ন পিতার সঙ্গে তর্ক করার সাহস হল না পুত্র জগদীশচন্দ্রের, কিন্তু তিনিও চিন্তা করে কোন কূলকিনারা পেলেন না; কি করে সাংসারিক এই রকম অর্থনৈতিক দুর্দিনে বহুদিন ধরে বিজ্ঞান পড়বেন? বিজ্ঞান একদিন দু' দিনের পড়া নয়। দীর্ঘদিন ধরে পড়তে হয়। যেখানে এক বেলা রোজগার করলে পরের বেলায় কি ভাবে চলবে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে বিজ্ঞান পড়ানোর গুরুভার কি করে সম্ভব হবে?

জগদীশচন্দ্র কোন তর্ক করলেন না। নিঃশব্দে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মায়ের কাছে গেলেন। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিযে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— এত চিন্তা করিস না। যা হোক একটা উপায় ভগবান ঠিক বার করে দেবেন।

জগদীশচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না, মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলেন, তারপর পায়ে পায়ে বাইরে চলে গেলেন।

সেদিন বিকেলবেলায় ভগবানচন্দ্র বামাসুন্দরী দেবীকে বললেন—সন্ধ্যেবেলায় সকলকে এ ঘরে ডেকো। আমরা সকলে মিলে একটা পরামর্শ করব। সে সময়ে যেন জগদীশও থাকে।

কিসের পরামর্শ, কেন পরামর্শ—কেউ সে কথা জানে না, জিজ্ঞাসা করার সাহসও কারুর নেই। সকলেই ভগবানচন্দ্রের নির্দেশমত সন্ধ্যার পর তাঁর ঘরে উপস্থিত হলেন। জগদীশচন্দ্রও বাদ গেলেন না। তিনি ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে রইলেন।

শয্যাগত ভগবানচন্দ্র কথা বলতে শুরু করলেন ধীর অথচ মৃদু কণ্ঠে—

—আজ কেন আমরা এক সঙ্গে বসেছি, তোমরা জানো না। সেইজন্যে এ বিষয়ে একটু বলে নেওয়া দরকার। ভগবানচন্দ্র এইটুকু কথা বলেই হাঁপিয়ে উঠলেন। একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—আজকে আমার যা অবস্থা হয়েছে, সংসার চালানোই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন অসুখে পড়ে থাকার জন্যে পুরো মাইনে পাই না। যেটুকু মাইনে পাই, সেটুকুও সুদের টাকা দিতে শেষ হয়ে যায়।

ভগবানবাবু একটু থেমে আবার বললেন—এ অবস্থায় জগদীশকে উচ্চশিক্ষা কি ভাবে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ চাইছি।

জগদীশচন্দ্র ধীর গম্ভীর অথচ নম্রভাবে জবাব দিলেন—এ অবস্থায় বিলেতে গিয়ে বিজ্ঞান বা ডাক্তারী পড়া সম্ভব নয়। সেইজন্যে বলেছিলাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে এখানে মোটা মাইনের চাকরি করি। তাতে সব সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভগবানচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন—তুমি একই কথা বার বার কেন বলছো? আমি তোমার পরীক্ষার ফল দেখেছি। বিজ্ঞানে তুমি যে নম্বর পেয়েছ, তা দেখেই আমার বিশ্বাস জন্মেছে, তুমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করলে জীবনে উন্নতি করবে।

—বেশ। আপনি যখন এতোবার বলছেন, তখন আমি ডাক্তারী পড়তে বিলেত যাব। ডাক্তারী পড়া শেষ হলেই অন্ততঃ কিছু রোজগার করতে পারব।

ভগবানচন্দ্র নীরবে শুয়ে রইলেন। তার মুখের ওপর দুঃখের গ্লানির এক পোঁচ কালো ছোপ। তার কাছে এমন একটি কপর্দক নেই যার সাহায্যে ছেলেকে বিলেত পাঠাতে পারেন।

—কি ভাবছো? এতক্ষণে মৃদু কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন বামাসুন্দরী।

—ভাবছি! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভগবানচন্দ্র উত্তর দিলেন—জগদীশ তো ডাক্তারী পড়ায় মত দিয়েছে, কিন্তু বিলেত পাঠাবার টাকা কোত্থেকে পাই?

বামাসুন্দরী দেবী এতক্ষণ নীরবে বাপ ছেলের তর্ক শুনছিলেন, এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন—তোমার আর কোন কাজ নেই, তাই, বাজে ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তা করছ।

কিন্তু সমস্যার সুরাহাট না হবে কি করে ভেবে পাচ্ছি না।

—ভাবতে হবে না। বামাসুন্দরী জগদীশের মাথা নিজের বুকে চেপে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললেন—ও কি আমার ছেলে নয়? ওর জন্যে কি আমার কোন চিন্তাই নেই?

ভগবানবাবু আমতা আমতা করে বললেন—কিন্তু তাতে ও বিলেত যাবে কি করে?

—আমার যা গয়না আছে, তা বিক্রি করলে ওর চারবার বিলেত যাতায়াতের খরচ হয়েও সংসার চলার জন্যে কিছু বেঁচে থাকবে।

বামাসুন্দরী আর কথা বললেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নিজের সাংসারিক কাজ করার জন্যে। পিতাপুত্র নির্বাক্ হয়ে বসে রইলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই ভগবানচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি আবার কাজে যোগ দিলেন এবং পুরো মাইনে পাওয়া শুরু হল। ধীরে ধীরে সংসারের অবস্থা আবার ভাল হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে জগদীশচন্দ্রের বিলেত যাওয়ার টাকাও ভগবানবাবু চাকরিস্থল থেকে যোগাড় করে ফেললেন, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হল না।

এমন সময় জগদীশচন্দ্রের এক জমিদার বন্ধু তাঁকে আসামের জঙ্গলে জন্তু শিকারের নিমন্ত্রণ জানালেন। জগদীশচন্দ্র ভাল শিকারী। যেমন বন্দুক চালাতে পারতেন, তেমনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন।

বাবা-মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে, তাঁরা অনুমতি দিলেন। আর মাস কয়েক পরেই ছেলে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে বিলেতে ডাক্তারী পড়তে যাবে। একটু মন ভাল থাকার জন্যে যদি দু'দিন ঘুরে আসে. তো আসুক না!

জগদীশচন্দ্র যথাসময়ে আসাম যাত্রা করলেন।

সন্ধ্যেবেলায় স্টেশনে নামলেন। একটু খোঁজ করতেই জগদীশচন্দ্র দেখতে পেলেন জমিদার-বন্ধু তাঁর জন্যে পালকি পাঠিয়ে দিয়েছেন। পালকিতে চড়ে জগদীশচন্দ্র জানতে পারলেন রাত্রিবেলায় বনপথ দিয়ে কমপক্ষে একুশ মাইল পথ যেতে হবে, তারপরে সেই বন্ধুর বাড়ি পৌঁছুন যাবে। সমস্ত রাত্রি পালকিতে করে, বনপথ পার হয়ে বন্ধুর বাড়ি পৌঁছুলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু' বন্ধুতে শিকার করতে বেরোলেন। সন্ধ্যের সময় যখন শিকার থেকে ফিরলেন, তখন জগদীশচন্দ্রের হাড় কেঁপে জ্বর এল। জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধু দু'জনেই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। হাড় কাঁপানো জ্বর। এক দিন দু'দিন পরে আবার এ জ্বর আসবেই। লোকে বলে এ জ্বর হয় ম্যালেরিয়া, নয় কালাজ্বর। এ জ্বর একেবারে সাক্ষাৎ যম-জ্বর। একবার এ জ্বর হলে আর সারতে চাইবে না। ক্রমশ বিছানায় নেতিয়ে পড়বে, তারপর একদিন মারা যাবে।

জগদীশচন্দ্র ভয় পেয়ে বন্ধুকে বললেন—থরথর করে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। এ জ্বরে আমি শয্যাগত হয়ে পড়বই ; তার আগেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

—কবে যেতে চাও ?

—এক্ষুণি। একটা পালকি পাওয়া যাবে ? বেশী দেরি হলে আমি আর কলকাতা ফিরতে পারব না। বিলেত যাওয়াও হবে না। বাঁচবো কিনা তাও সন্দেহ।

জমিদার বন্ধু তক্ষুণি লোক পাঠালেন পালকির জন্যে। কিন্তু সেই রাতে আর পালকি পাওয়া গেল না।

—একটা ঘোড়া পাওয়া যাবে ? জগদীশচন্দ্র যেন আসাম ত্যাগ করার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলেন।

—দেখছি।

বন্ধু নিজেই এবার ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ম্লান মুখে ফিরে এসে বললেন—একটা ঘোড়া আছে, তবে তা তোমাকে দেওয়া যাবে না।

—কেন ? জগদশচন্দ্রের ভ্রূকুটি।

—সেটা রেসের ঘোড়া। সে ঘোড়ার পিঠে চড়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেউ তার পিঠে চড়তে চায় না। কিছু দিন আগে একজনকে পিঠে নিয়ে এমনভাবে ফেলে দিয়েছিল, যে সে মারা যায় আর কি !

—ঘোড়া আনতে বল। জগদীশচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—দেখি তোমার কেমন ঘোড়া। আমাকে আজ রাতেই রওনা হতে হবে।

জগদীশচন্দ্র কোন কথাই শুনছেন না দেখে নিরুপায় হয়ে বন্ধুবর আস্তাবল থেকে ঘোড়া আনার নির্দেশ দিলেন।

ঘোড়া এল।

ঘাড় বেঁকিয়ে ঘোড়া দাঁড়িয়ে—

জগদীশচন্দ্র যেই তার পিঠে চড়তে গেলেন অমনি সে সামনের দু' পা তুলে দাঁড়িয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে গেল। জগদীশচন্দ্র ডানপাশে সরে গেলেন। ঘোড়া সামনের দু'পা নামিয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, অমনি মুহূর্ত মধ্যে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাগামে এমন হ্যাঁচকা টান দিলেন যে ঘোড়াটি তীব্রবেগে ছুটতে লাগল।

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেবারও সময় হল না। কঠোর ও কঠিন মালিকের হাতে পড়ে, সেই পাগলা ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলল। পথে গভীর বনপথ পড়েছে। নদী পড়েছে। নদীর কাঠের সেতু বন্যার জলে ভেঙ্গে গেছে। এ-ধারে সেতু ওধারে সেতু মাঝখানে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। জগদীশচন্দ্র দেখলেন এই সময় ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলে সে আর

সেতুর ভাঙা অংশ লাফ মেরে পার হতে পারবে না এবং ঘোড়াসুদ্ধ তিনি জলের মধ্যে পড়ে যাবেন। খরস্রোতা নদীর মধ্যে ঘোড়াসুদ্ধ পড়ে গেলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যু ঘটবে এ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

এক মুহূর্তে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। ঘোড়াটি তীরবেগে ছুটে গিয়ে লাফ মারল এবং অক্লেশে ভাঙা অংশ পার হয়ে সেতুর অন্য প্রান্তে পড়ল। তারপর নিরাপদেই আবার ছুটতে লাগল পাগলা ঘোড়া।

দীর্ঘপথ একটানা ছুটে ঘোড়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিল, আগেকার অন্য প্রভুর মত বর্তমান প্রভুটি নয়। ইনি একেবারে অন্য ধাতুর তৈরী। এঁর অবাধ্য হয়ে কোন লাভ নেই। বাধ্য হয়ে বরং চলাই শ্রেয়ঃ। বাকি পথটা ঘোড়া পোষমানা ঘোড়ার মতই শান্ত হয়ে মনিবের নির্দেশমত হেঁটে স্টেশনে পৌঁছুল। স্টেশনে পৌঁছে ক্লান্ত অবসন্ন জ্বরগ্রস্ত জগদীশচন্দ্র ট্রেনের কামরায় উঠে শুয়ে পড়লেন।

কলকাতায় যখন ফিরলেন তখনও জগদীশচন্দ্রের গায়ে জ্বর। একদিন দু'দিন অন্তর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। প্রথমে ম্যালেরিয়া রোগ সাব্যস্ত করে কুইনিন দেওয়া হল। কিন্তু জ্বর কমলো না। সকলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তখন দু'রকমের জ্বর খুব বেশী রকমের দেখা দিত। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে দু'জন চিকিৎসক এই ধরনের জ্বর নিয়ে ভীষণ ভাবে রিসার্চ করছেন। একজন রোনাল্ড রস্ যিনি ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করছেন, আর ডাক্তার থিশ্‌ম্যান্ কালাজ্বর নিয়ে গবেষণা করছেন;

কুইনিন দিয়ে যখন জ্বর ছাড়ল না, তখন ডাক্তার বাবুরা বললেন—জগদীশের কালাজ্বর হয়েছে।

কালাজ্বরের তখন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। ম্যালেরিয়ায় তবু কুইনিন দিলে কাজ হয়। কালাজ্বরের কোন উপায় নেই। ওষুধও চলছে, জ্বরও পালা করে আসছে। জগদীশচন্দ্রের চেহারাও শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে যেতে লাগল।

চিকিৎসা শুশ্রূষায় যখন উপকার হল না, তখন ডাক্তারবাবু বললেন—ও বিলেতে চলে যাক। জলবাতাস বদলে গেলে, আপনা থেকেই এ জ্বর চলে যাবে।

বাবা-মা, ঈশ্বরকে স্মরণ করে ডাক্তারবাবুর কথাই শুনলেন। তাঁরা জ্বরতপ্ত সন্তানকে ওষুধ-পথ্য দিয়ে জাহাজের বার্থে শুইয়ে দিয়ে এলেন; তাঁদের বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের বাতাসে জগদীশচন্দ্রের জ্বর সেরে যাবে।

জাহাজ ছাড়ল। নোনা জলের বাতাসে জাহাজের মধ্যে জগদীশচন্দের জ্বর আরও প্রবল ভাবে এল। জাহাজে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জগদীশচন্দ্র জ্বর গায়ে শুয়ে থাকেন; পাশে কোন আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছেন ইংলণ্ডের দিকে।

জাহাজের ডেকে অপরিচিত যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন—

আহা! ছেলেটি এমনভাবে ভুগছে, বোধ হয় আর বাঁচবে না ওর আর ইংলণ্ড পৌঁছুন হবে না।

জগদীশচন্দ্র নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথাগুলো শোনেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবেন, তিনি বিলেতে তো পৌঁছুতেই পারবেন না, এমন কি মৃত্যুর সময় বাবা-মা কি কোন আত্মীয়-স্বজন কাছে থাকবেন না।

জগদীশচন্দ্রের দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মায়ের মুখখানি মনে পড়ে বার বার।

—ডোণ্ট ক্রাই মাই বয়! উই আর হীয়ার ফর ইয়োর হেল্প্।

জগদীশচন্দ্র দেখলেন তাঁর বিছানার পাশে দু'জন বিদেশিনী। তাঁরা জগদীশের চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ মত ওষুধ পথ্য নিয়মিত খাইয়ে দেন। গা স্পঞ্জ করিয়ে দেন। যতক্ষণ না তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, ততক্ষণ ওঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেন বিদেশিনী মহিলাদ্বয়। জগদীশচন্দ্র তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর মা যেন ওই বিদেশিনীর বেশে আবির্ভূতা হয়ে তাঁর সেবা করে চলেছেন অহোরাত্র। মাতৃত্বের কোন দেশ-বিচার নেই, জাতবিচার নেই, সমাজবিচার নেই।

একদিন জগদীশচন্দ্রের জাহাজ লণ্ডনের মাটি স্পর্শ করল। দুই মহিলার অকৃত্রিম সেবা যত্নে জগদীশচন্দ্র অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

লণ্ডন মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভরতি হলেন জগদীশচন্দ্র তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. সার্টিফিকেট বিলেতের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট হিসেবে মেনে নেওয়া হল। জগদীশচন্দ্র মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন, যদিও তখনও শরীর একেবারে তাজা হয়ে ওঠে নি আর একটু পরিশ্রম করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

জগদীশচন্দ্র পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার ক্লাসে গিয়ে দেখলেন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি যা পড়ে এসেছেন, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অল্প দিনের মধ্যেই এই বিষয়গুলিতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন জগদীশচন্দ্র।

প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন রে ল্যাঙ্কেস্টার। অদ্ভুত সুন্দরভাবে পড়াতেন রে ল্যাঙ্কেস্টার। জগদীশচন্দ্র জীবনে এই প্রথম প্রাণিবিদ্যার বিষয় পড়াশুনা করলেন। একে নতুন বিষয়, তার ওপর ল্যাঙ্কেস্টারের আবেগময় সুন্দর বক্তৃতা। জগদীশচন্দ্র তন্ময় হয়ে প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। অবাকবিস্ময়ে ভাবলেন মানুষের দেহের মধ্যে আশ্চর্য আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ সদাসর্বদা চলছে, যার প্রভাবে আমরা দেখতে পাই, কথা বলতে পারি, শুনতে পাই, হাঁটতে পারি, অনুভব করতে পারি, ক্ষিধে পায়, যা খাই তা হজম হয়ে যায়; এই রকম আরও কত কী! জগদীশচন্দ্র যেন মন্ত্র-

মুগ্ধের মত শরীরের ভেতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতে লাগলেন।

বাদ সাধল জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য। যে জ্বর আসামের জঙ্গলে হয়েছিল, কলকাতায় ফিরে এসেও যে জ্বর সারে নি, জ্বরতপ্ত গায়ে জগদীশচন্দ্রকে জাহাজে চড়ে বিলেতে আসতে হয়েছিল, সেই জ্বর বিলেতে এসেও নিরাময় হল না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়, শরীর শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ে।

প্রাণিবিদ্যা পাঠের সঙ্গে শারীরবিদ্যা পাঠও চলে। তার সঙ্গে চলে শব ব্যবচ্ছেদ। মৃতদেহকে কেটে, তার ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বচক্ষে দেখে, সেই অঙ্গের বিষয় বা গ্রন্থির বিষয় পাঠ করলে সে সম্পর্কে আর ভোলা সম্ভব নয়। মৃতদেহের শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সেই অঙ্গ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, তখন রোগী বা রোগিণী পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা এবং তার চিকিৎসা করা সহজ হয়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে শব ব্যবচ্ছেদ করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় নিখুঁতভাবে শিখতে লাগলেন, কিন্তু—

কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না। ক্রমাগত জ্বর বাড়তে লাগল। তিনি ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়লেন; এই অবস্থাতেও জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিলেন এবং অনায়াসে পাস করে গেলেন।

জ্বরের প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে লাগল। মৃতদেহের দুর্গন্ধে অসুখ আরও বেড়ে গেল এবং প্রফেসর ল্যাঙ্কেস্টার খুব চিন্তিত হয়ে জগদীশচন্দ্রকে হাসপাতালের সব চেয়ে সেরা ডাক্তার প্রফেসর রিংগারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রিংগার জগদীশচন্দ্রকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, তারপর নানা রকমের ইনজেকশন দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করলেন ডাক্তার রিংগার কিন্তু কোন সুফলই হল না; ফলে রিংগার বাধ্য হয়ে বললেন—জগদীশচন্দ্রের পক্ষে ডাক্তারী পড়া সম্ভব নয়। ওর শরীরে সহ্য হবে না।

নিরুপায় হয়ে জগদীশচন্দ্র মেডিকেল পড়া ছেড়ে দিলেন। তাঁর জীবনের উচ্চশিক্ষার প্রথম অধ্যায় 'অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন' হয়ে গেল।

লণ্ডন থেকে কেম্‌ব্রিজ। মেডিকেল থেকে পিওর সায়ান্স। ডাক্তারী পাঠ ছেড়ে দিয়ে জগদীশচন্দ্র কেমব্রিজে বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করলেন। কিন্তু এখানেও সেই জ্বর পড়াশুনায় বাধা শুরু করল। এক দিন, দু'দিন বাদে বাদেই জগদীশ বিছানায় পড়তেন আর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটত। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন—এ জ্বর আসামের কুখ্যাত কালাজ্বর। এ জ্বরের কোন ওষুধ নেই। এ জ্বর হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ জ্বর হওয়া মানেই কালে ধরেছে। কাল যমের আর এক নাম, সেইজন্যে এ জ্বরকে বলা হয় যমজ্বর বা কালজ্বর। সাহেবরা ঠিক কালজ্বর উচ্চারণ করতে পারেন না, সেই জন্যে বলেন

কালাজ্বর। কালাজ্বরের কোন ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই, অতএব এ জ্বর মানেই যমরাজের হাতছানি। যে কোন দিন মৃত্যু ঘটতে পারে।

জগদীশচন্দ্র হতাশ আর বিরক্ত হয়ে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন। যে সমস্ত ওষুধের শিশি বোতল ছিল, সব ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন প্রাতঃভ্রমণে। সেদিন থেকে তিনি নিয়মিত নৌকো চালানো শুরু করলেন। রোয়িং-এর ব্যায়াম এবং সমুদ্রের বিশুদ্ধ বাতাসের মধ্যে ওজোন গ্যাসের প্রাধান্য—এই দুয়ের সমন্বয়ে ক্রমশ তাঁর শরীর ভাল হতে শুরু করল। জ্বরের প্রকোপও কমে এল। প্রথম প্রথম সপ্তাহে এক আধবার জ্বর আসতে লাগল, তারপর মাসে, এক আধবার আসতে লাগল—এইভাবে বছর দুয়েকের মধ্যে তিনি একেবারে নীরোগ হয়ে গেলেন।

জগদীশচন্দ্র এতদিন কারুর সঙ্গে মিশতেন না। মিশতে ভালও লাগত না। জ্বরের তাড়সে বিছানায় পড়ে থাকতেন। জ্বর সেরে যাবার পর আবার তাঁর পূর্বের ফূর্তি ফিরে এল। তিনি নিয়মিত ক্লাস করতে লাগলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দকোলাহল করা শুরু করলেন। কলেজের ভোজসভায় যোগ দিলেন। ক্রমশ অনেক বন্ধু হল। তাঁদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এই সম্পর্কে আরও তথ্য জানার জন্যে একটি সায়ান্স ক্লাবের সভ্য হলেন।

যে প্রতিভা অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন হয়ে পড়ছিল, নিজের চেষ্টায়, নিজের কঠোর সংগ্রাম আর সাধনায় আবার ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ঋষিতুল্য অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর বক্তৃতা যেমন জগদীশচন্দ্রকে আবেগে আপ্লুত করে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট্ কলেজের অসাধারণ কয়েকজন অধ্যাপকের বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন মাইকেল ফস্টার, ভ্রূণতত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রান্সিস বাঁফোর, উদ্ভিদতত্ত্বের শিক্ষক ফ্রান্সিস ডারউইন, উদ্ভিদবিদ্যার আর এক অধ্যাপক সিড্‌নী ভাইনস্ জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করলেন, যে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতেই পারতেন না। সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করলেন পদার্থবিদ্যার অসাধারণ জ্ঞানী অধ্যাপক লর্ড রেলিগ্। তাঁর বক্তৃতার ধরন, তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর শিক্ষাদানের সরল প্রথা এত সুন্দর ছিল যে জগদীশচন্দ্র মোহমুগ্ধের মত ফিজিক্স শিখতে লাগলেন।

কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে একটি বৃত্তি পেলেন জগদীশচন্দ্র। ক্রমশ জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ করল। কেমব্রিজের ক্রাইস্ট্ কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্ররা জগদীশচন্দ্রকে সমীহ করে চলতে লাগলেন ; কারণ জগদীশচন্দ্র একই সঙ্গে কেমব্রিজ থেকে বি. এ. আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি পড়তে লাগলেন।

এমন সময় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় চিঠি পেলেন জগদীশচন্দ্র। লিখছেন কলকাতা থেকে রসায়নশাস্ত্রের ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্র চিরকালই কেমিস্ট্রিতে অত্যন্ত ভাল ছিলেন, তার ওপর তাঁর অধ্যাপক ছিলেন প্রফেসার পেডলার। তাঁর অসামান্য শিক্ষাদানে প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নশাস্ত্র শিখলেন অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে এবং ঠিক করলেন বিলেত যাবেন। বাদ সাধল পিতার অর্থাভাব। হরিশ্চন্দ্রবাবুর তখন এমন অর্থবল নেই যে ছেলেকে বিলেত পাঠান। প্রফুল্লচন্দ্র দমে যাবার পাত্র নন। তিনি কী ভাবে বিলেত যাবেন চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় গিলক্রিস্ট নামে একটি স্কলারশিপ দিতেন। এই স্কলারশিপ লাভ করার জন্যে পরীক্ষা দিতে হত। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হত।

প্রফুল্লচন্দ্র এই পরীক্ষায় বসলেন। লণ্ডন ইউনিভারসিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমতুল হল এই পরীক্ষা। অকুতোভয় প্রফুল্লচন্দ্র এই পরীক্ষায় বসলেন।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষার ফল আর বেরোয় না। দিনের পর দিন পার হয়ে গেল। কোন খবর নেই। প্রফুল্লচন্দ্র ক্রমশ স্কলারশিপ পাবার সমস্ত আশাই ত্যাগ করলেন। মনের দুঃখে আগের পড়াশুনা শুরু করলেন।

একদিন প্রফুল্লচন্দ্র ক্লাসে বসে। তাঁর এক সহপাঠী পাশে এসে বসলেন। তাঁর হাতে একখানি স্টেট্সম্যান পত্রিকা। সহপাঠী সেই স্টেট্সম্যান পত্রিকাটি খুলে ধরে বললেন—একটা খবর দেখেছো ?

—কী ? প্রফুল্লচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

—এই দেখ। কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর বম্বের বাহাদুরজী গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই প্রফুল্ল নিশ্চয়ই তুমি নও।

—আমিই। দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রকৃত ব্যাপার খোঁজ করার জন্যে বেরিয়ে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই তিনি গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই স্কলারশিপ পাবার খবর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় ঘোষণা করে দিলেন কৃষ্ণদাস পাল।

প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন : আমি এস. এস. কালিফোর্নিয়া জাহাজে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তুমি আমাকে জাহাজ থেকে নামার পর পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও। আমি ও দেশের কিছুই চিনি না।

জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলেন এস. এস. ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজ থেকে।

॥ পাঁচ ॥

অকারণ রণে

বিজ্ঞানের সঙ্গে আপোসহীন রণে প্রবৃত্ত হলেন জগদীশচন্দ্র। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ঠিক করতে পারলেন না, কী কী বিষয়ে অধ্যয়ন করবেন, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে পড়াশুনা করবেন না। ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে না পারার জন্যে জগদীশচন্দ্র প্রত্যেক অধ্যাপকের ক্লাসেই যোগ দিলেন। তাঁরা এত সুন্দরভাবে পড়াতেন যে জগদীশচন্দ্রের কোন বিষয়ই খুব কঠিন বলে মনে হত না। বিষয়গুলি ভাল লাগত বলেই দিনরাত সেগুলো পড়াশুনা করতেন আর বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে ল্যাবোরেটরিতে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। যে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা কলকাতা শহরে অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন হয়ে যাচ্ছিল, তারই স্ফুরণ ঘটতে শুরু করল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ক্লাসে।

প্রথম বর্ষে শারীরবিদ্যা থেকে শুরু করে ধাতুবিদ্যা অধ্যয়ন করলেও দ্বিতীয় বর্ষে জগদীশচন্দ্র তাঁর পাঠ্যবিষয়ে একটা নির্দিষ্ট সূচী ঠিক করে নিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদবিদ্যা পাঠ্যসূচী হিসেবে গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক ভাইন্স্ পড়াতেন উদ্ভিদবিদ্যা। উদ্ভিদের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ে ‍ত অনেকদিন আগের কথা, যখন মাধবের কাঁধে চেপে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে লজ্জাবতীর লতা ছুঁতেন, আর লজ্জায় সমস্ত পাতাগুলো লতিয়ে যেত। কিন্তু কেন? প্রশ্নের উত্তর সেদিনও পান নি; কেমব্রিজের ক্লাসে বসেও কোন সদুত্তর পান নি ছাত্রজগতের জ্যোতিষ্ক জগদীশচন্দ্র। প্রশ্নটি অহরহ তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে রসায়নবিদ্যা আহরণ করলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক লর্ড র‍্যালের কাছে। তাঁর সুললিত বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রকে এত ভালবেসে ফেললেন যে প্রত্যহ একবার না পড়লে তাঁর মন কিছুতেই শান্ত হয় না। রসায়ন এবং উদ্ভিদবিদ্যার মতই পদার্থবিদ্যার শিক্ষাও আশ্চর্য রকমের সুদৃঢ় হয়ে গেল আপনা থেকেই। কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ যেভাবে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করে দিয়েছিলেন, সেই ভিত্তির ওপরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অসায়াসে শিক্ষার প্রাসাদ গড়ে তুলতে পারলেন আদর্শ শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র জগদীশচন্দ্র।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস

করলেন, একই বছরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্‌সি. পরীক্ষাতেও পাস করলেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে।

এবার দেশে ফেরার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। চার বছর তিনি বিলেতে এসেছেন। এই দীর্ঘদিন মা-বাবাকে না দেখার জন্যে মন ছটফট করতে লাগল এবং যত তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা যায়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জগদীশচন্দ্র দেখা করলেন লণ্ডনের পোস্টমাস্টার জেনারেল মিঃ ফসেটের সঙ্গে। মিঃ ফসেট ছিলেন জগদীশচন্দ্রের ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আনন্দমোহনবাবু ছিলেন সে-যুগের একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার।

জগদীশচন্দ্র মিঃ ফসেটের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর মিঃ বাসু ?

জগদীশচন্দ্র বললেন, এবার আমি দেশে ফিরতে চাই।

—আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বল ?

—দেশে ফিরে আমি যাতে একটা চাকরি পাই, সে বিষয়ে যদি একটু সাহায্য করেন।

—হুঁ। মিঃ ফসেট কিছুক্ষণ পায়চারি করে বললেন, বেশ আমি ভারত-সচিব লর্ড কিম্বারলিকে জিজ্ঞাসা করব ভারতে কোন চাকরি খালি আছে কিনা ? তুমি আমার সঙ্গে দু'-এক দিন পরে দেখা কোরো।

জগদীশচন্দ্র নমস্কার করে ফিরে এলেন এবং কথামত আবার দু'-এক দিন পরে গেলেন।

মিঃ ফসেট দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—লর্ড কিম্বারলি জানালেন, এখান থেকে কিছু হবে না। তোমাকে ভারতবর্ষে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।

জগদীশচন্দ্র নিঃশব্দে বসে রইলেন।

মিঃ ফসেট সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মন খারাপ করার কিছু নেই। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন আমার বন্ধুস্থানীয়। আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তোমার বিষয়ে। আশা করি, সেই চিঠি নিয়ে রিপনের সঙ্গে দেখা করলে একটা-না-একটা কিছু হবেই।

সেই চিঠি নিয়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। লর্ড রিপন তখন সিমলায়। জগদীশচন্দ্র সিমলায় গিয়ে রিপনকে মিঃ ফসেটের লেখা চিঠি পাঠিয়ে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লর্ড রিপন চিঠি পাওয়া মাত্র বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন জগদীশচন্দ্রকে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর আগমনের হেতু—

—আমি একটি ভাল চাকরি চাই।

মৃদু-হাসলেন লর্ড রিপন। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আমি তো ভারত-বাসীর ভাল চাই। ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু—

তিনি চুপ করে গেলেন। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর ক্ষোভ; জীবনের সমস্ত হতাশা যেন চোখে-মুখে ফুটে উঠছে।

জগদীশচন্দ্র কোন উত্তর দিতে পারলেন না। নীরবে বসে রইলেন। লর্ড রিপন মনের ক্ষোভ মনের মধ্যেই চাপা দিয়ে বললেন—তুমি কলকাতায় ফিরে যাও, আমি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে তোমার চাকরির জন্যে লিখে দেব। ওঁরা নিশ্চয়ই একটা কিছু করবেন।

জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লর্ড রিপনের চিঠি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে এসে পৌঁছুল। জগদীশচন্দ্রকে যেন শিক্ষা বিভাগে একটি ভাল কাজ দেওয়া হয়।

শিক্ষা অধিকর্তা স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট্ চিঠি পড়ে নাক মুখ কোঁচকালেন। তিনি ভাবতেই পারেন না, ভারতীয়রা কি করে বিজ্ঞান পড়াবে? ভারতীয়রা নাচ-গান হই-হল্লা কবিত্ব আধ্যাত্মিকতা এইসব করতে পারে, ভাবতে পারে—বিজ্ঞান - থুঃ!

—না হে, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস-এর কোন চাকরি খালি নেই। ইচ্ছে করলে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের একটা ছোট চাকরি দিতে পারি।

পা নাচিয়ে কথাগুলো বললেন অ্যালফ্রেড সাহেব। জগদীশচন্দ্রের চোখ দু'টো মুহূর্তের মধ্যে আগুনের মত জ্বলে উঠল অপমানে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—না। ভিক্ষে নেওয়ার মত চাকরি নিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

জগদীশচন্দ্র নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাড়ি ফিরে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। একে অর্থাভাব, তার ওপর এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে শুধু এক সাহেবের খামখেয়ালীতে! কিন্তু কোন উপায় নেই। পরাধীন ভারতে সাহেব যা করবে, তাই ঠিক। সাহেবরা কখনও ভুল করতে জানে না, সাহেবদের সাতখুন মাফ। ওরা হচ্ছে রাজার জাত। ভীষণ বুদ্ধিমান, তা নইলে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে এসে রাজত্ব করতে পারে? ওদের সাম্রাজ্য এত বড় যে বৃটিশ রাজত্বে কখনও সূর্য অস্ত যায় না।

সকলেই যে খারাপ ছিল তা নয়। অনেক স্বনামধন্য ইংরেজ মনীষী ভারতের উন্নতির জন্যে বহু কিছু করেছেন; এবং সেইজন্যে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়ে গেছেন।

লর্ড রিপন নিয়মিত গেজেট দেখে যাচ্ছিলেন। বিস্মিত না হলেও বিরক্ত হয়ে দেখলেন, যাঁকে চাকরি দেবার জন্য ক্রফট্‌কে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর নাম তো প্রকাশ হচ্ছে না; সে কি তাহলে চাকরি পায় নি? না আদৌ চাকরির জন্যে খোঁজ করতে যায় নি? ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালীরা একটু বেশী আরামপ্রিয়, ডালভাত আর মোটা কাপড় পেলেই ওরা খুবই খুশী। আর কিছু চায় না।

লর্ড রিপন গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নাম দেখতে না পেয়ে বাংলার গভর্নরকে লিখে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রিপন জানতে পারলেন, অ্যালফ্রেড ক্রফট্ জগদীশচন্দ্রকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস দিতে রাজী হন নি এবং জগদীশচন্দ্রও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস নিতে রাজী হন নি। জগদীশচন্দ্র অ্যালফ্রেডের দেওয়া প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস-এর চাকরি প্রত্যাখ্যান করে চলে আসেন।

লর্ড রিপন জগদীশচন্দ্রের এই আচরণে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলেন। তাঁকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের জন্য পাঠানো হয়েছে, কেন তাঁকে প্রভিন্সিয়াল অল্প মাইনের চাকরির কথা বলা হবে? এ রীতিমত অপমান।

লর্ড রিপন শিক্ষা বিভাগকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন জগদীশচন্দ্রের চাকরির জন্যে। বাধ্য হয়ে অ্যালফ্রেড আবার জগদীশচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। জগদীশচন্দ্র দেখা করলেন।

অ্যালফ্রেড জগদীশচন্দ্রকে বললেন—তুমি বিজ্ঞান পড়াতে চাও?

—প্রথম থেকেই তো তাই বলে আসছি।

সাহেবের গোবদা মুখ রাগে আরও ফুলে উঠল।—পারবে পড়াতে? ইণ্ডিয়ানরা সায়ান্সের কিস্সু জানে না?

—এ কথা প্রমাণিত হবে, আমি যখন ছেলেদের পড়াবো। তার আগে নয়।

—হুঁ। আলফ্রেড সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আই. আই. এস চাকরির নিয়মটা নিশ্চয়ই জানো?

আই. আই. এস. কথাটির পুরো নাম জগদীশচন্দ্র জানতেন। ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল সার্ভিস। কিন্তু নিয়মকানুন কি, তা তিনি জানতেন না। জগদীশচন্দ্র অল্পক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—না। আমি কোন নিয়ম জানি না।

—এ চাকরির নিয়ম হল, উই—দী ইংলিশ পিপলস্—যদি একশো টাকা মাইনে পাই, তোমরা দী ইণ্ডিয়ানস্ উইল গেট ওন্‌লি সেভেন্টি ফাইভ রুপিজ।

—এই যদি আইন হয়ে থাকে, তাই মেনে নিলাম। জগদীশচন্দ্র উত্তর দিলেন।

স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট্ বললেন—ঠিক আছে দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমাকে আমরা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেব।

জগদীশচন্দ্র বিদায় নিলেন। অ্যালফ্রেড প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে ডেকে পাঠালেন। সে সময়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সি. এইচ. টনি। টনি সাহেব ভারতীয়দের সহ্য করতে পারতেন না একেবারে এবং বাঙালীদের খুব হীন চোখে দেখতেন। ক্রফট্ সাহেব যখন জগদীশচন্দ্রের চাকরির কথা বললেন, তখন প্রতিবাদের সুরে টনি সাহেব চিৎকার করে উঠলেন—হোয়াট? অ্যান ইণ্ডিয়ান উইল বী এ প্রফেসর? আই কাণ্ট টলারেট ইট!

ক্রফট্ সাহেব মৃদু হেসে বললেন—ওভাবে তম্বি-হম্বি করে কোন ফল হবে না। লর্ড রিপন স্বয়ং ভদ্রলোকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ইণ্টারেস্টেড। আমি তো আগেই হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু লর্ড রিপন এতোবার খোঁজ নিয়েছেন যে বাধ্য হয়ে চাকরির কথা দিতে হয়েছে।

—খোঁজ নিয়েছেন বলেই চাকরি দিতে হবে? গভর্নর জেনারেলের কাছে কত লোকই তো যায়। ওসব কিছু না, কিছুদিন চুপচাপ ব্যাপারটা চেপে গেলে লর্ড রিপন এ ব্যাপার ভুলে যাবেন।

—না। তা নয়। লর্ড রিপন প্রত্যেকবার গেজেট দেখেন আর ভদ্রলোকের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না দেখতে পেয়ে, প্রত্যেকবার আমার কাছে খোঁজ করেন। এবার আর খোঁজ করেন নি রীতিমত শাসিয়েছেন। এ অবস্থায় চাকরি না দিয়ে কি করি বলুন?

—ঠিক আছে, ও কী করে চাকরি করে দেখা যাক! টনির মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল—গীভ হিম অ্যাপয়েন্টমেণ্ট বাট ডোণ্ট মেক হিম পার্মানেণ্ট। রেস্ট আই উইল ডু—

ক্রফট্ সাহেব কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, সাময়িকভাবে চাকরি দিলে টনি সাহেব কীভাবে জগদীশচন্দ্রকে জব্দ করবেন?

যাই হোক, আর কোন তর্ক না করে টনি সাহেবের পরামর্শ অনুসারে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট্ জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্স-এর প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ করে বললেন, তিনি যেন কাজ বুঝে নেবার জন্যে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি. এইচ. টনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মা-বাবাকে প্রণাম করে জগদীশচন্দ্র নিয়োগপত্র দেখালেন। ভগবানবাবু তখনও ঋণভারে জর্জরিত। বয়সের ভারে যেমন নুইয়ে পড়েছেন, ঋণের ভারে তেমনি কাবু হয়ে গেছেন। তিনি প্রায় শয্যাগত। বামাসুন্দরী দেবীও স্বামীর অসুস্থতার জন্যে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। তার ওপর সাংসারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই সময় জগদীশচন্দ্রের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেখে তাঁরা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। দু'জনেই প্রাণ খুলে ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন।

জগদীশচন্দ্র নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে যথাসময়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে দেখা করলেন। প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর চিঠিটা ফেরত দিয়ে টেবলের উলটো দিকের দিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—প্লীজ সীট ডাউন।

জগদীশচন্দ্র আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ টনি হাসতে হাসতে বললেন—কংগ্র্যাচুলেশন মিঃ বাসু। আপনি কাজে যোগ দিচ্ছেন, আমি আগেই খবর পেয়েছি।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হেসে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিলেন—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

ক্রমশ টনি সাহেবের মুখ গম্ভীর হতে লাগল। তিনি বললেন—কাজে

যোগ দেবার আগে আমি কয়েকটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, অন্তত জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।

—বলুন।

—দেখুন, উই দী ইংলিশম্যান হ্যাভ নো ফেথ অন ইউ রিগার্ডিং সায়ান্স। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতীয়রা কবিত্ব করতে পারে, নাচ-গান করতে পারে, দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। বিজ্ঞানের কোন বিষয় তাদের মাথাতেই ঢোকে না, পড়াবে কি করে?

জগদীশচন্দ্র বুঝতে পারলেন, প্রচ্ছন্নভাবে মিঃ টনি তাঁকে অপমান করছেন। অপমানে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু বহু কষ্টে রাগের ভাব দমন করলেন, কারণ এ কথা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, এঁরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করেছেন। কোন রকমে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে পারলে, অবাধ্য, কলহপ্রবণ, অত্যন্ত রাগী এইসব বিশেষণ দিয়ে ভাইসরয় লর্ড রিপনের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে বলবেন—আমরা তো চাকরি দিয়েছিলাম, ও নিজের দোষেই রাখতে পারল না; আমরা কি করব বলুন?

জগদীশচন্দ্র রাগ প্রকাশ না করে, মুখে হাসি এনে বললেন—যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—কি করে করবেন জানি না? মিঃ টনি অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীতে আপনমনেই বললেন—আপনাদের দেশে শেষ বৈজ্ঞানিক ছিলেন নাগার্জুন। তার আগে অবশ্য হিন্দু এবং বৌদ্ধযুগে চরক, সুশ্রুত, জীবক, অগ্নিবেশের মত অনেক বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু নাগার্জুনের পর আর কোন বৈজ্ঞানিক আপনাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি। আপনাদের রক্ত থেকে বিজ্ঞান একেবারে মুছে গেছে। প্রায় দু' হাজার বছর কোন চর্চা নেই। কি করে যে কি করবেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

অবাক্ বিস্ময়ে জগদীশচন্দ্র মিঃ টনির দিকে তাকালেন। শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নীচু হয়ে এল। মিঃ টনি বিদেশীয় হয়েও ভারতের ইতিহাস যেভাবে পড়েছেন, যা অনেক ভারতীয়রাও পড়েন নি। জগদীশচন্দ্র সশ্রদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আপনার কথার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য। যেদিন থেকে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে এ দেশ বিজ্ঞানের চর্চা ভুলে গেছে। বিজ্ঞানচর্চা করার সাহস পায় নি। সেইজন্যে এ দেশ থেকে বিজ্ঞান মুছে গেছে।

জগদীশচন্দ্র অল্পক্ষণ থামলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—সায়ান্স ইজ এ সাবজেক্ট অফ প্যাট্রনেজ। রাজশক্তি উৎসাহিত না করলে, বিজ্ঞানের কখনও উন্নতি হতে পারে না। হিন্দু যুগের সম্রাটরা বিজ্ঞানীদের অসম্ভব রকম শ্রদ্ধা করতেন, রিসার্চ করার জন্যে যত টাকা প্রয়োজন, বিনাপ্রশ্নে রাজকোষ থেকে দেওয়া হত। বৈজ্ঞানিকদের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব সম্রাটের রাজকোষ গ্রহণ করত, তাই নাগার্জুনের মত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ টনির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা রাজার জাত। রাজার প্রতিনিধি। আপনারা যদি ভালভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, দেখবেন আবার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হবে।

মিঃ টনিও জগদীশচন্দ্রের চোখের দিকে তাকালেন। তিনিও অত্যন্ত চালাক। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন—জগদীশচন্দ্র বিদ্রূপ করছেন, না সত্যি কথাই বলছেন।

জগদীশচন্দ্র মাথা নীচু করে নিলেন। মিঃ টনি ঠিক বুঝতে পারলেন না জগদীশচন্দ্রের মনের অবস্থা।

প্রসঙ্গ বদলে ফেলে মিঃ টনি কাজের কথায় ফিরে এলেন আবার—মিঃ বাসু! আপনি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পেয়েছেন, তার সঙ্গে এই চিঠিটাও গ্রহণ করুন, কারণ এইটেই আমাদের নিয়ম।

জগদীশচন্দ্র পত্রখানি হাতে নিলেন। ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলেন। ইংরিজীতে লেখা, বাংলা তর্জমা করলে অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ তুমি যতদিন ফিজিক্স-এর অধ্যাপক পদে অস্থায়িভাবে চাকরি করবে, ততদিন তোমার মাইনের অর্ধেক তুমি পাবে—।

জগদীশচন্দ্র চিঠিখানি পড়ে আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন মিঃ টনির সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে মিঃ টনিও ঘাবড়ে গেলেন একেবারে। তিনি ভেবেছিলেন, এই চিঠি পাবার পরই জগদীশচন্দ্র রাগে জ্বলে উঠবেন। অপমানে দিকবিদিক হারিয়ে চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের উদ্দেশে অপমানের কথা বলবেন, আর সেই সুযোগে চাকরিটি নাকচ করে দিয়ে পুরো ঘটনা অতিরঞ্জিত করে ক্রফট্ সাহেব রিপন সাহেবের কাছে পেশ করে দেবেন।

—তাহলে আমি কবে থেকে কাজে জয়েন করব?

জগদীশচন্দ্রের নির্বিকার কথা শুনে টনির হুঁশ ফিরে এল। তিনি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন—কাল থেকেই কাজে জয়েন করবেন।

শেষবারের মত অভিনন্দন জানিয়ে জগদীশচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জগদীশচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন, কীভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়? এভাবে ভারতীয়দের ওরা অপমান করে যাবে, আর আমরাও নির্বিবাদে তা সহ্য করে যাব—এ জিনিসও চিরকাল সম্ভব নয়।

কিন্তু কীভাবে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়? ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি করা সম্ভব নয়। ঝগড়া না করে অন্যভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে।

চিন্তা করতে করতে জগদীশচন্দ্র বাড়ি পৌঁছুলেন। মা জগদীশচন্দ্রের ম্লান মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে?

জগদীশচন্দ্র এক এক করে সমস্ত ঘটনা মায়ের কাছে ব্যক্ত করলেন। মা

এটটুও বিচলিত না হয়ে ধীরকণ্ঠে বললেন—চল। খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে। তোর জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছি।

মুখ হাত পা ধুয়ে জগদীশচন্দ্র খেতে বসলেন। মা খাবার সাজিয়ে সামনে বসে ছেলের খাওয়া দেখতে দেখতে আলোচনা করতে লাগলেন।

বামাসুন্দরীদেবী বললেন—দেখ বাবা, ওরা হচ্ছে রাজার জাত। ওদের সঙ্গে বন্দুক হাতে লড়াই করতে গেলে জেতার কোন আশাই থাকবে না। বরং হেরে ভূত হয়ে যাবি।

—তাই বলে ওরা যা বলবে, যে অত্যাচ'র করবে—মুখ বুজে সহ্য করতে হবে?

—হ্যাঁ হবে।

—হবে? কত দিন? ওদের মত শক্তি তো আমাদের কোনদিন হবে না। তার মানে বলতে চাও, চিরকাল আমাদের অপমান সহ্য করতে হবে?

মা ছেলের দিকে তাকালেন। পরম স্নেহে জগদীশচন্দ্রের মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—উপায় আছে। যদি তোমরা সেই পথে লড়াই করতে পার, তাহলে জিতলেও জিততে পার।

মায়ের মুখের দিকে তাকালেন জগদীশচন্দ্র। মায়ের মুখের কথা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে ছেলে তাকিয়ে রইলেন মায়ের দিকে।

মা ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন—তোমরা যখনই নিজেদের কাজেকর্মে প্রমাণ করতে পারবে, ওদের থেকে তোমরা মোটেই হেয় নও, বরং ওদের থেকে অনেক বেশী জানো, তখন আপনা থেকেই দেখবে ওঁরা তোমাদের শ্রদ্ধা করছেন, সমীহ করছেন, ভয় করছেন। যতক্ষণ না তোমাদের কৃতিত্ব প্রমাণ করছ, ততক্ষণ তোমাদের কেউ মানবে না। তোমাদের চিৎকার চেঁচামেচি ঝগড়া করাই সার হবে।

অবাক বিস্ময়ে জগদীশচন্দ্র মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিলেতের কেমব্রিজ এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেও যে কথা অনুধাবন করতে পারেন নি, কোন বিদ্যালয়ে না গিয়েও, মা সেগুলি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে জগদীশচন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে আমি কি করব বলে দাও?

—কাজে যোগ দাও, কিন্তু নিজের মর্যাদাও হারিয়ো না।

বামাসুন্দরীদেবী তাঁর স্বভাবসুলভ মর্যাদার সঙ্গে কথা বললেন—কাজে যোগ দাও, কিন্তু তোমার কাজের ন্যায্য মাইনে যতদিন না দেবে, ততদিন কোন মাইনে নেবে না।

—সেকি? তাহলে সংসার চলবে কি করে? জগদীশচন্দ্র বিষণ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমরা যদি না খেয়ে মারাও যাই, তাহলেও অমর্যাদার কাছে মাথা নোয়াব না। বামাসুন্দরীর কথাগুলির মধ্যে যেন বারুদের উত্তাপ। চোখ দিয়ে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আগুন ঝলসে উঠল।

একমুহূর্ত নীরব নিথর জগদীশচন্দ্র। মায়ের এ রূপ তিনি কখনও দেখেন নি এর আগে। মায়ের শরীরের ভেতর থেকে যেন এক জ্যোতির বিকীরণ। সেই জ্যোতি মুহূর্তমধ্যে জগদীশচন্দ্রের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁকে অমিততেজ করে তুলল।

জগদীশচন্দ্র পরমুহূর্তে মাকে প্রণাম করে দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—তোমার আদেশই শিরোধার্য। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

অমানুষিক পরিশ্রম করতে হল জগদীশচন্দ্রকে।

মায়ের আশীর্বাদ নয়, মায়ের আদেশ। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, তুমি ইংরেজদের চেয়েও ধীমান, ক্ষমতাবান এবং কর্মঠ। জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্লাসরুমে ঢুকলেন। ছেলেরা আগে থেকেই বসে আছে ক্লাসরুমে। সামনের দিকের দু'-একটা বেঞ্চ খালি। টেবিলের ওপর রোল-কলের খাতা।

জগদীশচন্দ্র ক্লাস শুরু করবেন, ঠিক সেই সময়ে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—স্যার, রোল কল করবেন না? অনেক ছেলে আপনার ক্লাস থেকে পালিয়েছে।

জগদীশচন্দ্র হাসলেন।

তিনি ছেলেটিকে মিষ্টি স্বরে বললেন—আমি কোন দিন রোল কল করব না। তোমাদের ইচ্ছে হলে আমার ক্লাসে এস. ইচ্ছে না হলে এসো না। ক্লাস হয়ে গেলে, তোমরা নিজেদের নামের পাশে, নিজেরাই প্রেজেণ্ট করে নিও।

জগদীশচন্দ্র পরমুহূর্ত থেকে পড়ানো শুরু করলেন। মাত্র কয়েক মিনিট। ছাত্ররা বিস্ময়বিমুগ্ধ। বিজ্ঞানের কঠিনতম বিষয়, এতদিন যা নীরস, কর্কশ লাগত। যে জন্যে ছাত্রেরা পালিয়ে যেত ক্লাস থেকে; সেই কঠিন বিষয়গুলি জগদীশচন্দ্রের কথার সুললিত ভঙ্গীতে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল। আশ্চর্য হয়ে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল। কখন যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবার ঘণ্টা পড়েছে, কেউ খেয়ালও করে নি। শুনেই যাচ্ছে মাস্টারমশায়ের পড়ানো।

জগদীশচন্দ্র থামলেন। বিজ্ঞানের স্বপ্নরাজ্য থেকে ছাত্রদল বক্তৃতা থামার সঙ্গে আবার বাস্তব জগতে ফিরে এল। জগদীশচন্দ্র বললেন—বিজ্ঞানের যে বিষয়ে আজ পড়ালাম, তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে। পরের দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের এই বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেব আর বুঝিয়ে দেব।

ছাত্ররা নিঃশব্দে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। অন্যদিন ছেলেরা হই-হুল্লোড় করে বেরোত, যেন জেলখানা থেকে বেরিয়েছে ভাবত, কিন্তু সেদিন এত নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, প্রত্যেকের মনের ভাব, আরও অনেকক্ষণ ক্লাসে থাকলে বেশ ভাল হত। ক্রমশ কলেজময় রটে গেল জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য সুন্দর পড়াতে পারেন! যত সুন্দরভাবে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র পড়াতে পারেন, তার চেয়েও ভালভাবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্যে প্রমাণিত করতে পারেন।

ছেলেরা ক্লাসে আগে যাবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিত। শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নয়, কলকাতার অন্য সব কলেজের ছাত্ররাও চলে আসত জগদীশচন্দ্রের ক্লাসে অশ্রুতপূর্ব ক্লাস শোনার জন্যে। ক্লাসে রোল কল করা তো দূরের কথা, এত ছাত্রের সমাগম হত যে জায়গা দেওয়াই সম্ভব হত না। অনেকে ঘরের পেছনদিকে, ডেস্কের আশেপাশে, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনত। লেকচার শুনতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত, শুনতে না পেলে জীবন বৃথা হয়ে গেছে ধারণা হত।

মাস শেষ হয়ে গেল। পরের মাসের পয়লা তারিখে মাইনের জন্যে জগদীশচন্দ্রের ডাক পড়ল অফিস ঘরে।

সাহেব মাইনের খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন—প্রফেসর বাসু, প্লাজ টেক ইওর স্যালারি অ্যাণ্ড সাইন দি ভাউচার!

জগদীশচন্দ্র দেখলেন, ভারতীয়দের জন্য যে অল্প মাইনে ধার্য করা আছে, তারও অর্ধেক হিসেব করে সাহেব খামে করে রেখে দিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হেসে খামটা ফেরত দিয়ে বললেন—প্লীজ কীপ ইট। আই স্যাল ওয়ার্ক উইদাউট স্যালারি।

জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাইনের টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন। যতদিন না তিনি সম্মানজনকভাবে বেতন পাবেন, ততদিন কিছুতেই গ্রহণ করবেন না একটি পয়সাও। এ তাঁর মায়ের আদেশ। মাতৃ আজ্ঞা কোন দিন অবজ্ঞা করতে পারেন না আদর্শ সন্তান, আদর্শ মানুষ। জগদীশচন্দ্র ছিলেন আদর্শ সন্তান, আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ শিক্ষক।

নিদারুণ অর্থকষ্ট। ভগবানচন্দ্র তখনও ঋণভারে জর্জরিত। পাওনা-দারেরা অকথা-কুকথা বলে যাচ্ছে। একটি পয়সাও শোধ দিতে পারছেন না ভগবানবাবু। একদিন যিনি রাজার মত ছিলেন, আজ অর্থের অভাবে আর পাওনাদারের অপমানে শয্যাগত।

না, তবুও না।

বামাসুন্দরীদেবী অটল অনড়। জগদীশচন্দ্রকে দৃঢ়তার সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন—যদি তোমার মনে হয় এই মাইনে নিলে অসম্মান হবে, কক্ষণো নেবে না। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও নয়।

এক মাস নয়, দু'মাস নয়, দীর্ঘ তিন বছর।

একটি দিনের জন্যে জগদীশচন্দ্র ছেলেদের পড়ানোতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি, একটুও বিরক্তি দেখান নি। প্রথম দিন যেমনি উৎসাহে ছেলেদের পড়িয়েছিলেন, প্রত্যেকদিন একই রকমের উৎসাহ নিয়ে ছেলেদের শিক্ষাদান করেছেন। ছাত্ররা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বোসের নামে অজ্ঞান। তাঁর ক্লাস হলে আর কিছুই চায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জগদীশচন্দ্র যদি বিজ্ঞানের কঠিনতম বিষয় পড়ান, একটি ছেলেও বিরক্ত হয় না, একটি ছাত্রও ক্লাস পালিয়ে যায় না, বরং অন্য কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে জুটে যায়।

তিন বছর পরে একদিন মিঃ টনি মিঃ ক্রফট্‌কে বললেন—প্রফেসর জে. সি. দারুণ ভাল প্রফেসর। যে কোন ইংলিশম্যানের চেয়ে ভাল।

মিঃ ক্রফট্‌ মৃদু হেসে বললেন—আমিও আপনাকে ঠিক একই কথা বলব ভেবেছিলাম। আমি গোপনে ওঁর লেকচার শুনেছি। আশ্চর্য সুন্দর পড়ান।

—হুঁ। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টনি ক্রফট সাহেবকে বললেন—আমার একটা বিনীত অনুরোধ আছে।

—ইয়েস ?

—প্রফেসর বাসুকে এবার স্থায়ী করে দিন।

—আপনি আমাকে লিখুন, আমি সঙ্গে সঙ্গে করে দেব। শুধু তাই নয়, ওঁকে গত তিন বছরের পুরো মাইনেও মিটিয়ে দেওয়া হোক।

—নিশ্চয়ই। সে কথাও আমি আমার চিঠিতে লিখে দেব।

অধ্যক্ষ টনি সেই দিনই চিঠি লিখলেন শিক্ষা অধিকর্তাকে। মিঃ ক্রফট্‌ সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে দিলেন জগদীশচন্দ্রের তিন বছরের মাইনে আর অধ্যাপকের স্থায়ী পদ, একেবারে খাস ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল সার্ভিস-এর নিয়ম অনুযায়ী।

টাকা! অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে পেলেন জগদীশচন্দ্র। সমস্ত টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন—মা! তিন বছরের মাইনে একসঙ্গে পেয়েছি। এই নাও—

মা টাকাগুলো নিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ টাকা নিয়ে তুমি কি করতে চাও ?

—বাবার যা ঋণ আছে সব শোধ করে দিতে চাই।

মায়ের চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। আনন্দের অশ্রু না গর্বের অশ্রু ?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বামাসুন্দরী বললেন—তাহলে তো আজ বিকেলে হিসেব করে দেখতে হয়, তোর টাকায় কতদূর শোধ করা যায় ?

সন্ধ্যেবেলাতে মা-ছেলেতে বসলেন। পাশের ঘরে ভগবানবাবু রোগশয্যায় শয়ান। তিনি ছেলে এবং স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নেই।

জগদীশচন্দ্র এবং বামাসুন্দরী দু'জনে সন্ধ্যের পর হিসেব করতে বসলেন। তিন বছরের পুরো মাইনে জড়ো করেও দেখা গেল, সব ধার শোধ হচ্ছে না। জগদীশচন্দ্র শুকনো মুখে মায়ের দিকে তাকালেন, বামাসুন্দরী দেবী নির্ভীক হাসি হেসে বললেন—তোর বাবার এখনও কিছু সম্পত্তি আছে। সেগুলো বিক্রি করে, তোর টাকার সঙ্গে যোগ করলে হয়ত দেনা শোধ হয়ে যেতে পারে।

জগদীশচন্দ্র চিন্তা করে পেলেন না বাবার সম্পত্তি কোথায় আছে, কিন্তু মায়ের সামনে কোন কথা বলতেও সাহস হল না।

বামাসুন্দরী বিনাদ্বিধায় তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি এবং গয়না বিক্রি করে দিলেন। বিক্রি করার আগে স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানবাবু আপত্তি করতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—আমার গয়না কি তোমার নয়? আমার সম্পত্তি কি তোমার নয়?

এর পর আর কিছু বলতে সাহস হয় নি ভগবানচন্দ্রের।

মায়ের গয়না এবং সম্পত্তি বিক্রির টাকা আর ছেলের তিন বছরের পুরো মাইনে জড়ো করে পাওনাদারদের এক এক করে ডেকে পাঠালেন জগদীশচন্দ্র। এক এক করে প্রত্যেক পাওনাদারকে মিটিয়ে দিলেন তাদের প্রাপ্য। তবু সব শোধ হল না। সামান্য কিছু ধার থেকে গেল সকলের কাছেই, কারণ যে টাকা সঞ্চয় করেছিলেন মা-ছেলেতে মিলে, সমস্ত ধার শোধ করতে তা কুলোল না।

পাওনাদারেরা কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন ওঁদের ব্যবহার দেখে। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে এভাবে তাঁদের ঋণ শোধ করে দেবেন জগদীশচন্দ্র। তাঁরা সকৃতজ্ঞভাবে বললেন—আমরা আর চাই না। যা দিয়েছেন, তাতেই পুরো ঋণ শোধ হয়ে গেল।

—না। জগদীশচন্দ্র ধীরভাবে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন না, তা হবে না। ধার ধারই। আজ শোধ করতে না পারলেও ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করব। সে বিশ্বাসটুকু আমার ওপর রাখতে পারেন।

অভিভূত মহাজনেরা একস্বরে বললেন—আমরা তো বলেইছি আমাদের আর টাকা লাগবে না, তবু তুমি যখন শোধ দিতে ইচ্ছুক, যতদিনে পারবে দিও, আমরা একটি কথাও বলব না।

জগদীশচন্দ্র মাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। ভগবানবাবু অসুস্থ অবস্থায় সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠতে পারলেন না। এক বছরের মধ্যেই দেহত্যাগ করলেন।

জগদীশচন্দ্রের মন অত্যন্ত ভেঙে পড়ল। স্নেহশীলা জননীও হতাশায় ভেঙে পড়লেন। দৈনিক খাওয়া পরিত্যাগ করলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। সালঙ্কারা জননীর রূপ দেখতে জগদীশচন্দ্র অভ্যস্ত। বিধবার শুভ্র বেশ ছেলের হৃদয়ে শেলের মত আঘাত করত। তিনি মায়ের দিকে মুখ

তুলে তাকাতে পারতেন না। কিছুক্ষণ কথা বলে, কোন একটা উপলক্ষের কথা উঠিয়ে সেখান থেকে চলে যেতেন। মা হাসতেন। ছেলে এবার মানুষ হয়েছে। এবার ছেলের বিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। বিয়ে পরে হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর আর এ জগতে থাকার দরকার নেই। যাঁর জন্যে এতকাল তিনি শক্ত হয়ে সংগ্রাম করেছেন, তিনি সসম্মানে এ জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। আর কেন? এবার তাঁর যাবার পালা। খাওয়া পরিত্যাগ করলেন। ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়ল সেই স্বর্গীয় সুষমা। শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। তারপর একদিন—

দু' বছরের মাথায় মা দেহত্যাগ করলেন।

॥ ছয় ॥

ঈর্ষা কণ্টকিত পথে

এ যেন এক নতুন জগদীশচন্দ্র।

মা-বাবার মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্র যেন এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চললেন। এ পদক্ষেপ সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপ। মা-বাবা যে প্রতিজ্ঞার রূপ উদ্ভাসিত হতে দেখেন নি, তার প্রথম রশ্মিছটা উপলব্ধি করলেন জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী শীতের শুভরাত্রে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীদুর্গামোহন দাশের কন্যা শ্রীমতী অবলাদেবীর শুভবিবাহ হল। জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে যদি ইস্পাতের মত কঠিন প্রতিজ্ঞা থাকে, অবলাদেবীর চরিত্রে ছিল ধৈর্যের প্রতিমা মূর্তি। কোন অবস্থাতেই তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না; তাঁর বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত স্বামীকে বুঝতে দিতেন না। কীভাবে সংসার চলছে, জগদীশচন্দ্রকে কোনদিন বুঝতে দেন নি অবলাদেবী।

প্রথম অবস্থায় কলকাতায় বাসাবাড়ি করে থাকার মত অর্থবল তাঁদের ছিল না। চন্দননগরের একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে কোনমতে দিন গুজরান করতেন। জগদীশচন্দ্র কলকাতায় এসে পড়াতেন, বিকেলবেলায় অবলাদেবী নৌকো করে গঙ্গাপার স্বামীকে নিতে আসতেন। ফেরার সময়ে দু'জনে নৌকোয় চড়ে ফিরতেন। সেই প্রত্যাবর্তনে যে আনন্দ, তাতে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি মুছে যেত। এক স্বর্গীয় উৎসাহে জগদীশচন্দ্রের মন ভরে উঠত।

—আমি রিসার্চ করতে চাই অবলা। নৌকোর মধ্যে জগদীশচন্দ্র অবলাদেবীকে মনের কথা বললেন।

মৃদু হেসে অবলাদেবী বললেন—শখের রিসার্চ যেন না হয়। মরণপণ করে যদি রিসার্চ করতে পারো, আমি বাধা দেব না, বরং সাহায্যই করব।

—কিন্তু যদি বিফল হই? যদি কোন দিন সার্থক হতে না পারি? সামনের ভাগীরথী স্রোতের দিকে তাকিয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন। তিনি যেন কতদূর থেকে কথা বলছেন। এ কণ্ঠস্বর অবলাদেবীর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

জগদীশচন্দ্র একই সুরে বলতে লাগলেন—কত কথাই যে মনে আসে—কি করব কিছুই ভেবে পাই না। এই যে ভাগীরথী—এক একবার মনে হয় কোথায় এর উৎস—যদি জানতে পারতাম—

বাধা দিয়ে অবলাদেবী বললেন—জানবে, সব জানবে—কিন্তু একটির পর একটি। প্রথম যেটিতে হাত দেবে, আগে সেটিকে শেষ কর। জীবনে যতক্ষণ প্রথম সার্থকতা না আসছে, ততক্ষণ তার পরের সার্থকতা আসে না।

ভাগীরথার ধীর স্থির তরঙ্গের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে জগদীশচন্দ্রের নৌকো। পাশাপাশি বসে আছেন জগদীশচন্দ্র আর অবলাদেবী। নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলেছে মাঝি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশের বুকে চাঁদের পূর্ণ বিকাশ। বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। জ্যোৎস্নার প্লাবন এসেছে গঙ্গার জলে। সেই গঙ্গার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন—অবলা, যে কাজে নামবো, তার শেষ কোথায় আমি জানি না। যদি ব্যর্থ হই, কী হবে, তাও জানি না। তুমি সেই আঘাত সহ্য করতে পারবে তো?

গঙ্গার জলে হাত ডোবানো ছিল অবলাদেবীর। জল কেটে চলেছিল তাঁর হাত। জ্যোৎস্না মেশানো হাতে কাটা স্রোত এক আশ্চর্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। সেই সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে অবলাদেবী জগদীশচন্দ্রের চেয়েও ধীরকণ্ঠে বললেন—আমি নামে অবলা হলেও, দুর্গামোহন দাশের মেয়ে, চিত্তরঞ্জন, সুধীরঞ্জন দাশের বোন, আর সবচেয়ে বড় কথা তোমার সহধর্মিণী। তুমি যদি কষ্ট স্বীকার করতে পার, আমিও হাসিমুখে পারব।

জগদীশচন্দ্র নিঃশব্দে নিজের হাতখানি অবলাদেবীর হাতের ওপর রাখলেন। অবলাদেবীর বাঁ হাত স্বামীর হাতের নীচে, ডান হাত পবিত্র গঙ্গাস্রোতের ভেতর। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চিত শিহরণ তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। তিনি যেন গভীর আবেগের সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করলেন, এমনি সুরে স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন—আমি কোন দিন তোমার ভার হবো না, চিরকাল আমি তোমার প্রেরণা হয়ে থাকব।

জগদীশচন্দ্র মুখে কোন কথা বললেন না। মনে মনে এক অব্যক্ত প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অটল করে তুললেন।

দিন দিন নতুন গবেষণা শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে

তখন ল্যাবোরেটারী বলে কোন ঘরই ছিল না, যা ছিল, তাকে ল্যাবোরেটারী বলা চলে না। জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণা করতে হলে ভাল গবেষণাগার আর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, এই সব যন্ত্রপাতি নিজের হাতেই তৈরি করে নেবেন। কে তৈরি করবে? কোথায় তখন আধুনিক কালের বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা, যারা স্পেসিফিকেশন অনুসারে যন্ত্র তৈরি করে দেবেন। যন্ত্রপাতি চালিয়ে দেখিয়ে দেবেন সব ঠিক আছে, তারপর টাকা নেবেন।

জগদীশচন্দ্র একজন টিনের মিস্ত্রী ডেকে আনলেন। তাকে বললেন—আমাকে একটা জিনিস তৈরি করে দিতে পারবে?

—কি জিনিস বলুন? বলুন কী করতে হবে?

নিজের হাতে যে ছবিটা এঁকেছিলেন কাগজের ওপর, সেটি মিস্ত্রীর সামনে ধরে জগদীশচন্দ্র বললেন—এই রকম একটি যন্ত্র আমাকে তৈরি করে দিতে হবে।

মূর্খ লোকটি ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা চুলকে বলল—দেব কত্তা তৈরি করে।

মিস্ত্রী সেইদিন থেকেই যন্ত্র তৈরি করা শুরু করে দিল। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের কথা বুঝতে হলে আমাদের আরও খানিকটা পেছিয়ে যেতে হবে পদার্থবিদ্যার আবিষ্কারের ইতিহাসে; বিশেষ করে, আলোকের এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গের আবিষ্কারের ইতিহাসে।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল* বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেন। ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, বিদ্যুতের তরঙ্গ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে পারে। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টির কথা বললেন, সেই অনুসারে অঙ্ক কষে দেখাবার চেষ্টা করলেন তিনি যা বলেছেন, তা অভ্রান্ত। যেহেতু ম্যাক্সওয়েল কোন পরীক্ষা করেন নি, সেইজন্যে তাঁর বক্তব্যকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না বৈজ্ঞানিকেরা। কিন্তু একেবারে অস্বীকার করলেন না, কারণ তিনি যে অঙ্ক কষেছিলেন, তা ভুল নয়।

একই সময়ে জার্মানীতে এক বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর নাম হেনরীচ হার্জ**। তিনি ম্যাক্সওয়েলের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন এবং সে সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন গবেষণাগারে।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন হার্জের ভক্ত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ানোর সময় তিনি হার্জের গবেষণাগুলো নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে ছেলেদের দেখাতেন,

* ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল = Clark Maxwell (British).

** হেনরীচ্ হার্জ = Heinrich Hertz (German).

আর সেই দেখেই ছেলেরা এমন মুগ্ধ হয়ে যেত যে একটি কথাও বলত না। আশ্চর্য হয়ে পরীক্ষাগুলো দেখত, নইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের দুর্নাম ছিল। তারা যদি লক্ষ্য করত, মাস্টারমশায় খারাপ পড়াচ্ছেন, হইচই বাধিয়ে দিত। সাহেব মাস্টার বলে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না। একবার গোলমাল এত বেশী হয়েছিল যে, প্রিন্সিপ্যাল বাধ্য হয়ে কমিশন বসিয়ে আসল কারণের খোঁজ করে তার সুরাহা করতে বাধ্য হন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষাগারের মধ্যে এমন সুন্দর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন যে ছেলেরা অবাক হয়ে দেখত। জগদীশচন্দ্র অধিকাংশ পরীক্ষা হার্জের তথ্য থেকেই করতেন এবং বিশ্বাস করতেন, হার্জ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্যে যে পথে চলেছেন, সে পথ অভ্রান্ত।

হার্জ কৃত্রিম উপায়ে ম্যাক্সওয়েলের তথ্যানুসারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল।

জগদীশচন্দ্র হার্জের সর্বাধুনিক আবিষ্কারও পরীক্ষা করে ছাত্রদের দেখিয়ে দিতেন। ছাত্রদের সর্বাধুনিক জ্ঞান বিতরণ করলে সব সময়ে যে ছাত্রদেরই উপকার হয়, এ বিশ্বাস তিনি করতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর নিজের উপকারও যথেষ্ট হত, এ বিশ্বাস তাঁর এত দৃঢ়ভাবে ছিল যে ছেলেদের শেখানোর সময় তিনি এমনভাবে বলতেন যে, তাঁর নিজের হৃদয়েও প্রত্যেকটি কথা গেঁথে যেত।

হার্জ তড়িতের সাহায্যে ঈথর তরঙ্গ সৃষ্টি করে পদার্থবিদ্যার আর এক নতুন অধ্যায় গড়ে তুললেন। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেছেন, পৃথিবীর বুকে যেখানে জল স্থল বাতাস আলো আছে, সেখানে বিদ্যুৎ আছে, শব্দ আছে, কিন্তু যেখানে জল স্থল বাতাস নেই, যেখানে মহাকাশ শূন্য। সেখানে কী আছে? সেখানেও কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। হার্জ আবিষ্কার করে বললেন—সেখানে ঈথর আছে। ঈথর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ঈথর কাঁপে। ঈথরের কম্পনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সেই অনুভূতির জন্যেই আলো দেখতে পায় মানুষ। ঈথরের তরঙ্গ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলে যায়, আর সেই তরঙ্গ আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়ে আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে। ঈথরের কম্পনেই সমস্ত আলোর সৃষ্টি। কম্পনসংখ্যা যদি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহলেই সেটা আমাদের কাছে আলো বলে মনে হবে। এক সেকেণ্ডে এই কম্পন যদি চারশো লক্ষ কোটি হয়, তাহলে যে আলো উৎপাদন হবে, তার রঙ হবে লাল। এই কম্পনসংখ্যা যদি এক সেকেণ্ডে বেড়ে গিয়ে আটশো লক্ষ কোটি হয়ে যায়, তাহলে লাল রঙ বদলে গিয়ে বেগুনী রঙের আলো হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, দৃশ্যমান আলোকের

রঙ অদৃশ্য ঈথরের গতি কম্পনের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়। লাল বেগুনীর মাঝখানের কম্পনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে সাত রঙের অন্যান্য রঙ দেখতে পাওয়া যায়। যেমনি কম্পনসংখ্যা আছে, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষায় দেখলেন, ঠিক তেমনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আছে। এক এক দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এক এক রকমের রঙ তৈরি করে। লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল এক ইঞ্চির ২৫,০০০ ভাগের এক ভাগ। বেগুনী রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। তরঙ্গের কম্পন এবং দৈর্ঘ্যের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর বুকে পদার্থবিদ্যার অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে।

হার্জ বিদ্যুতের সাহায্যে ঈথর তরঙ্গ তৈরি করলেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিক খুলে গেল।

ঈথর তরঙ্গ কিন্তু চোখে দেখা যায় না। এর অস্তিত্ব আছে, প্রমাণ করবে কি করে? হার্জ তারও ব্যবস্থা করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে ঈথরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। হার্জ দৃঢ়তার সঙ্গে একথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই গবেষণা বেশীদূর এগোনোর আগেই অকস্মাৎ হার্জ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

হার্জের একনিষ্ঠ শিষ্য জগদীশচন্দ্র মর্মান্তিকভাবে ভেঙে পড়লেন গুরুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, কিন্তু শোকে মূহ্যমান না হয়ে হার্জ যেখানে কাজ শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে কাজ শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র গবেষণা করতে লাগলেন। হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন, আর সাধারণ আলোক তরঙ্গ একই গোত্রের। দুটোই ঈথর-তরঙ্গ। তবে তাদের রঙ আলাদা, দৈর্ঘ্য আলাদা। জগদীশচন্দ্র ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন, আলোর কতকগুলো স্বাভাবিক ধর্ম আছে; যেমন, আলো সব সময়ে সোজাপথে চলে! সোজাপথে চলে বলেই নীরেট পদার্থে আলোর তরঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আর সেইজন্যেই নীরেট অস্বচ্ছ পদার্থের ছায়া পড়ে! আলো কোন কঠিন পদার্থের ওপর আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেই আলো প্রতিফলিত হয়। আলোর গতি স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করলে ব্যাহত না হলেও বেঁকে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, আলোর-তরঙ্গের কোন শৃঙ্খলা নেই। কতকগুলো ওপর-নীচে কম্পিত হয়ে যাচ্ছে, কতকগুলো আবার ডাইনে বামে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে যায়। কিন্তু কতকগুলো স্ফটিক আছে, যার ভেতর দিয়ে আলো গেলে, আলোক-তরঙ্গের এলোমেলো ভাব ঠিক হয়ে সব তরঙ্গগুলিই একমুখী হয়ে যায়।

হার্জ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করলেন। হার্জ ভাবলেন, যে আলো দেখা যায়, তারও যে ধর্ম, যে আলো দেখা যায় না, তারও সেই ধর্ম হওয়া উচিত। হার্জের কথাগুলি বেঠিক নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার

সুযোগ পাবার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পৃথিবীর সমস্ত কার্যকলাপের যবনিকাপাত ঘটল।

জগদীশচন্দ্র রিসার্চ শুরু করলেন। ফিজিক্স-এর গুরু হেনরীচ হার্জ যেখানে রিসার্চ অসম্পূর্ণ রেখে অপ্রত্যাশিতভাবে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্র সেই জায়গা থেকেই রিসার্চের কাজ শুরু করলেন।

দৃশ্য আলোক কাচের ভেতর ঢুকে বেঁকে যায়। হীরের মধ্যে গেলে আরও বেশী বেঁকে যায়। লঘুতর মিডিয়াম থেকে ঘনতর মিডিয়ামে প্রবেশ করলে আলোর গতি বেঁকে যায়। জগদীশচন্দ্র ভাবলেন, দৃশ্য আলোর যে ক্ষমতা আছে, অদৃশ্য আলোরও সেই ধর্ম থাকা উচিত। তিনি একের পর এক পরীক্ষা করতে লাগলেন। গবেষণার পর গবেষণা। আলো যেমন মিডিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, মিডিয়ামেরও তেমনি আলো বিচ্ছুরিত করার ক্ষমতা আছে। দৃশ্য আলোকমালাকে কাচ যত বেশী ছড়িয়ে দিতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিচ্ছুরণ করার ক্ষমতা হীরের, সেইজন্যে হীরে অত বেশী চকচক করে, উজ্জ্বল দেখায়।

জগদীশচন্দ্র চিন্তা করলেন, দৃশ্য আলোক সম্পর্কে যে সব ধর্ম প্রযোজ্য, অদৃশ্য আলোক সম্পর্কে সেই সব ধর্ম একইভাবে প্রযোজ্য এবং সত্য। জগদীশচন্দ্র দেখলেন, দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে হীরের যে ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সম্পর্কে চীনামাটির ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী। কল্পিত দৃষ্টিতে চীনামাটির পাত্রের ওপর যে অদৃশ্য আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে, তা যদি দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে হীরের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখাবে।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র সামান্য অশিক্ষিত মিস্ত্রীকে দিয়ে যন্ত্র তৈরি করে নিলেন। সামান্য যন্ত্র। একটি টিনের চাকতি, যাকে ইংরিজীতে বলা হয় গ্যালিনা* তার সঙ্গে সামান্য এক টুকরো তার। জগদীশচন্দ্র এই গ্যালিনা ডিটেকটর যন্ত্র দিয়ে নানা রকম আবিষ্কারের গবেষণা শুরু করলেন। নির্জন গবেষণাগার। তাঁর মনের মধ্যে কত রকমের কল্পনা। শিশুকালে মাধব ডাকাতের সঙ্গে নদীতীরে বসে মাঝিদের ভাটিয়ালী গান শুনতেন তন্ময় হয়ে। সেদিন মাঝ-দরিয়ার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন, আর আজ এই নির্জন গবেষণাগারে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ভাবছেন, সেই গানের সুর কী দেশের বাতাস থেকে বন্দী করে এখানে এই শহরের বুকে ধরে এনে শোনা যায় না ?

না—না—তারের মাধ্যমে নয়। তারের ভেতর দিয়ে বহুদূরের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যায়। এডিনবার্গের আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল এ পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন ১৮৭৬ সালে। নাম দিয়েছেন টেলিফোন।

*গ্যালিনা = Galena.

না, তারের মাধ্যমে দূরের কথা শোনানোর মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই, কোন মৌলিকত্ব নেই। বিনা তারে যদি কথাবার্তা পাঠানো যায়, তাহলে একটি আবিষ্কারের মত আবিষ্কার হবে। বিনা তারে দেশের মাঝির গান কলকাতা শহরে ধরে এনে ইচ্ছেমত শোনা যাবে। এই গবেষণার সূত্রপাত করলেন জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে।

জগদীশচন্দ্র দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রিসার্চ করে চলেছেন। যে লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব, তার মুখে একটা নল লাগালেন জগদীশচন্দ্র। সেই নলের সামনে একটি কৃত্রিম চোখ লাগালেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। চোখের কাঁটা নড়ে উঠল! কাঁটা নড়ার অর্থ, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কাঁটায় গিয়ে আঘাত করছে। এবার তিনি কৃত্রিম চোখ একধারে সরিয়ে দিলেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আগের মতই স্ফুরিত হচ্ছিল, কিন্তু এবার আর কাঁটা নড়ল না। তার অর্থ, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চোখের কাঁটায় আঘাত করে উত্তেজনা সৃষ্টি করল না। এই গবেষণা থেকে জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত করবার চেষ্টা করলেন, অদৃশ্য আলোক তরঙ্গ সরল সোজা-পথে যায়। আকা বাঁকা পথে তার কোন গতি নেই। আলোর তরঙ্গ আয়নার ওপর প্রতিফলিত হয়ে অন্যদিকে ছিটকে যায় আলোর ছটা, একথা সকলেই জানেন। জগদীশচন্দ্র তার আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে দেখালেন, একইভাবে অদৃশ্য আলোকও আয়নার ওপর পড়ে প্রতিফলিত হয়। দৃশ্যমান আলো যেমন কাচের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে বেঁকে যায়, তেমনিভাবেই অদৃশ্য আলোও বেঁকে যায়।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে চলেছেন আর নতুন নতুন তথ্য পৃথিবীর মানুষের কাছে শোনাচ্ছেন। পরীক্ষা করতে করতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলেন জগদীশচন্দ্র! দৃশ্য আলো জল, কাচ প্রভৃতি মাড়িয়া স্বচ্ছ। এদের ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে যায় অনায়াসে। ইঁট-পাটকেল, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ নিরেট বা অস্বচ্ছ। এইসব পদার্থের ভেতর দিয়ে দৃশ্য আলোক যাতায়াত করতে পারে না। অদৃশ্য আলোর ধর্ম কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। অদৃশ্য আলো জলের ভেতর দিয়ে যায় না, অথচ ইঁট-পাটকেল, আলকাতরা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অনায়াসে চলে যায়।

জগদীশচন্দ্র ক্রমাগত পরীক্ষা করে চলেছেন। তার কোন দিকে কোন হুঁশ নেই। তিনি পৃথিবীকে নতুন কিছু দান করবেন। মানুষের জীবনকে উন্নততর করে তোলার জন্যেই মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, তাঁর ব্যক্তিগত অর্থাগমের জন্য নয়।

জগদীশচন্দ্র আবার পরীক্ষা করলেন। এবারের পরীক্ষায় তিনি দেখালেন, সাধারণ আলোকতরঙ্গ সর্বদিকেই যায়, কিন্তু টুর্মালিন* জাতীয় স্ফটিকের

* টুর্মালিন = Taurmaline.

ভেতর দিয়ে গেলে সমস্ত আলোক তরঙ্গ একমুখে, একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই আলোর সামনে যদি আর একখানি টুর্মালিন ধরা যায়, তার ভেতর দিয়েও আলোকতরঙ্গ একমুখো হয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু নব্বুই ডিগ্রীর সমকোণে ঘুরিয়ে দিলে তার ভেতর দিয়ে আর অদৃশ্য আলো যেতে পারবে না।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের একটি দিন। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির প্রফেসর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে ইলেকট্রিক সরঞ্জাম রাখলেন। দরজার মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন ফাদার লাফোঁকে, পাহারা দেবার জন্যে। কেউ যাতায়াত করছে কিনা দেখার জন্যে, অথবা কোন তারের সংযোগ গোপনে জগদীশচন্দ্র পাশের ঘরের সঙ্গে করেছেন কিনা। পাশের ঘরে ইংরেজ প্রফেসর পেডলারের টেবিলের ওপর পিস্তল রেখে দিলেন জগদীশচন্দ্র, তারপর বেরিয়ে এলেন সে-ঘর থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে। ফাদার লাফোঁকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন জগদীশচন্দ্র। লাফোঁ দরজা বন্ধ করে দিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের সামনে সুইচ টিপলেন আর মুহূর্ত মধ্যে পাশের ঘরে পিস্তলের শব্দ গর্জন করে উঠল পেডলারের টেবিলে। একেবারে বিনা তারে বিনা সংযোগে। দু'ঘরের মধ্যে কঠিন মোটা দেওয়াল অদৃশ্য আলোকতরঙ্গকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, এবং বৈজ্ঞানিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আলোকতরঙ্গকে চালিত করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

জয়জয়কার! জগদীশচন্দ্রের জয়জয়কার। বিনা তারে জগদীশচন্দ্র এক-স্থান থেকে অন্য আর একস্থানে বার্তা প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ একেবারে অবিশ্বাস্য অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।

বাংলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষার কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন—আমি দেখতে চাই অবিশ্বাস্য ঘটনা। জগদীশচন্দ্র রাজী হলেন।

টাউন হলের ভেতর পরীক্ষার স্থান নির্ধারিত করলেন জগদীশচন্দ্র। পঁচাত্তর ফিট দূরে দু' দুটো ঘরের ওপারে, তৃতীয় ঘরে সাহেবকে বসিয়ে দিলেন পিস্তলের সামনে। জগদীশচন্দ্র একটি উঁচু বাঁশ লাগালেন, তার মাথায় একটি ধাতব চাকতি লাগিয়ে দিলেন। সবাই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। জগদীশচন্দ্র বললেন—মাননীয় গভর্নর সাহেব আমার কাছ থেকে তিনটে ঘরের ওপারে আছেন, মাঝখানে তিনটে ঘরের শক্ত দেওয়াল। সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি। পিস্তলের সামনে বসে আছেন স্বয়ং ম্যাকেঞ্জি সাহেব। আমার থেকে সাহেবের দূরত্ব পঁচাত্তর ফিট। আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন তারের সংযোগও নেই। স্বাভাবিক-ভাবে আমি যদি সুইচ টিপি, কোন বার্তাই সাহেবের কাছে পৌছুন উচিত

নয়। কিন্তু আমার আবিষ্কারে সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আমি এখানে বসে সুইচ টিপবো, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের সামনে পিস্তল গর্জে উঠবে একেবারে বিনা তারে, বিনা সংযোগে। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বিনা তারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সংবাদ পাঠানো যাবে, পৃথিবীর বুকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের সুইচ টিপে দিলেন আর মুহূর্তমধ্যে পঁচাত্তর ফিট দূরে, অন্য ঘরের প্রান্তে উপবিষ্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সামনে আচমকা পিস্তল গর্জে উঠল। ঘটনাটা এত আকস্মিক ঘটে গেল যে ভয়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ভুঁড়ি ওপর-নীচে দুলতে লাগল। দু'জন সিপাহী সাহেবকে ধরে কোন মতে সামাল দিল।

জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি উপস্থিত জনগণ এবং সুধীসমাজকে বুঝিয়ে দিলেন। সেই সভায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেক জ্ঞানীগুণী এবং বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকরাও ছিলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বন্ধুগণ! আপনারা আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতি দেখে হয়ত অনেকে অবাক হয়ে গেছেন, অনেকে ভাবছেন এটা একটা ম্যাজিক বিশেষ, কিন্তু যাঁরা ফিজিক্স পড়েছেন, বিশেষ করে ফিজিক্সের আলোর অধ্যায় পাঠ করেছেন এবং মহামতি হার্জের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি কিছু নতুন কাজ করি নি। তাঁরই অসম্পূর্ণ কাজ আমি শুধু সম্পন্ন করেছি।

দৃশ্য আলোর মতই অদৃশ্য আলো আছে। দৃশ্য আলো স্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, যদিও পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে এঁকে-বেঁকে যায়। দৃশ্য আলো ইট কাঠ পাথর দেয়াল প্রভৃতি অস্বচ্ছ বা নীরেট পদার্থের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। নীরেট পদার্থের গায়ে ধাক্কা লেগে আলো প্রতিফলিত হয়, একথা আমার মত আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন।

এইবার শুনুন আমার আবিষ্কৃত অদৃশ্য আলোর ধর্মের কথা। এই অদৃশ্য আলো ইট কাঠ পাথর দেয়াল প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। এই অদৃশ্য আলোর বিভিন্ন আকার আছে, কোনটি সরু এবং লম্বা, আবার কোনটি মোটা এবং বেঁটে। এবার দেখুন, আমার সামনে একটি যন্ত্র রয়েছে। যন্ত্রটি অতি সাধারণ ও সামান্য। আমি একটি মিস্ত্রীকে ডেকে নিজের হাতে করিয়েছি। একে আমি বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি ট্রান্সমিটার। এই যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যে অদৃশ্য আলোকতরঙ্গ ইচ্ছে করব, সেইগুলো ধরে ফেলতে পারব।

জগদীশচন্দ্র একটু থামলেন। উপস্থিত জনসাধারণ নির্বাক হয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছেন। সামনের সারির একপাশে বসে অবলাদেবী। তাঁর হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে

গর্বে ফুলে উঠছে। চোখে বারবার আনন্দাশ্রু এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে—তিনি আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন আর স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

—আপনারা হয়ত আমার কথাগুলো ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। জগদীশচন্দ্র উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার বক্তব্যকে আমি আরও সহজ সরল করে তোলার চেষ্টা করছি। কল্পনা করুন একটা জায়গায় লম্বা লম্বা বক আর মোটা বেঁটে হাঁস একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দল বেঁধে। আমার এই যন্ত্রটিকে একটি খাঁচা কল্পনা করুন। সরু সরু শিক দিয়ে খাঁচার বেড় আছে। ওই বক আর হাঁস দল বেঁধে আমার খাঁচার মধ্যে ঢোকার জন্যে কিচিরমিচির শুরু করে দিল। সরু সরু ফাঁক দিয়ে লম্বা রোগা বকগুলো অনায়াসে ঢুকে খাঁচাবন্দী হয়ে গেল, কিন্তু বেঁটে মোটা হাঁসগুলো বাইরে আটকে গেল, তারা সরু ফাক দিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকতে পারল না। ঠিক তেমনি সরু সরু অদৃশ্য আলোক আমার তৈরি যন্ত্রের মধ্যে ঢুকতে পারে, মোটাগুলো পারে না। ট্রান্সমিটারের চরিত্র পালটে দিলে মোটা আলোগুলো ঢুকতে পারবে, সরু সরু লম্বাগুলো পারবে না। এইভাবে আমি যে অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গকে ইচ্ছে করব, আমার যন্ত্রের মধ্যে ধরে রাখতে পারব, তারপর সেই আলোকতরঙ্গকে একমুখী পাঠিয়ে দিতে পারব। আমি আগেই প্রমাণ করেছি, টুর্মালিন স্ফটিকের ভেতর দিয়ে যদি আলোকতরঙ্গ যায়, তাহলে বহুমুখী তরঙ্গ শৃঙ্খলিত হয়ে একমুখী হয়ে যায় এবং আমার ইচ্ছানুযায়ী পথে বার্তা প্রেরণ করতে পারি।

মহামান্য মিঃ ম্যাকেঞ্জির সামনে একটি যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রটিও আমার তৈরি এবং অতি সাধারণ যন্ত্র। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, একটি লাঠির মাথায় একটি ধাতুর চাকতি রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তার। এই তার আমার রিসিভিং যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। আজকের পরীক্ষায় রিসিভিং যন্ত্র ছিল পিস্তল। আমি আমার ঘর থেকে যেই সুইচ দিয়েছি, নির্ধারিত অদৃশ্য আলোকতরঙ্গকে ট্রান্সমিটার যন্ত্র মুহূর্তমধ্যে ধরে পাঠিয়ে দিল নির্ধারিত পথে। সেই পথে মিঃ ম্যাকেঞ্জির রিসিভিং যন্ত্র ছিল, এবং সেই যন্ত্র আমার প্রেরিত শব্দ গ্রহণ করে তারের সাহায্যে নেমে এসে টেবিলের ওপর রাখা পিস্তলের শব্দ ভেসে উঠেছে।

বন্ধুগণ! রিসিভিং যন্ত্রটি যত উঁচু এবং বড় করা হবে, তত দূর থেকে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব হবে। আমি ঠিক করেছি, আমার বাড়িতে কুড়ি ফুট উঁচু একটা রিসিভিং সেণ্টার লাগাবো, এবং দেখবেন এক মাইল দূরের কলেজ থেকে আমি অনায়াসে বিনা তারে যে কোন বার্তা বাড়িতে পাঠাতে পারব।

জগদীশচন্দ্র থামলেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ নিথর। তাঁরা যেন আশ্চর্য রকমের এক জাদু দেখে সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেব আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে পরম সম্মানের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, অধ্যাপক

জে. সি. বাসু যে পরীক্ষা আমাদের দেখালেন, তা নিঃসন্দেহে মৌলিক এবং আশ্চর্য। আমি আমার সরকারের তহবিল থেকে এই মুহূর্তেই এক হাজার টাকা মঞ্জুর করছি, যাতে এই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আরও সুন্দরভাবে রিসার্চ করতে পারেন।

সভা ভঙ্গ হল। উপস্থিত সকলেই জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দনে আপ্লুত করে দিলেন। একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবলাদেবী। তিনি মনে মনে স্বামীগর্বে গর্বিতা হলেও মুখে এমন ভাব করেছিলেন, যেন কত বিষণ্ণা। জগদীশচন্দ্র তাঁর কাছে এসে বললেন—তুমি এত বিষণ্ণ কেন?

—কই না? নিজের চোখ মুছলেন অবলাদেবী।

—তুমি কাঁদছ, আর বলছো যে তোমার মন খারাপ নয়? কি হয়েছে বল?

—আজ বারবার তোমার বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ছে। আজ যদি তাঁরা থাকতেন—

মুহূর্তমধ্যে জগদীশচন্দ্রের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি একটি কথাও কারুর সঙ্গে বলতে পারলেন না; অবলাদেবীর ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু গম্ভীরভাবে বললেন—বাড়ি চল।

দু'জনে বাড়ির পথে হাঁটলেন।

ঈর্ষা কণ্টকিত পথ।

জগদীশচন্দ্র অধ্যাপনার কাজ করার পর নিজস্ব মৌলিক গবেষণা করতেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, জগদীশচন্দ্র নিশ্চয়ই অধ্যাপনার কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজস্ব মৌলিক গবেষণা করে থাকেন, সেইজন্যে তাঁরা বললেন, জগদীশচন্দ্র যেন অধ্যাপনার কাজে কোন রকম গাফিলতি না দেখান। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর যে কাজ ন্যায্য, তা যেন তিনি সুচারুরূপে পালন করেন।

মৃদু হাসলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি চিঠি দিয়ে দেখা করলেন অনেকদিনের বন্ধু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সি. এইচ. টনি আর স্যার অ্যালফ্রেড্ ক্রফট্-এর সঙ্গে। ওঁরা হেসে বললেন—প্রফেসর বাসু, একদিন আমরা তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমরা, বৃটিশ পিপল, ভেবে থাকি, তোমরা মানে ইণ্ডিয়ানরা আবার কি রিসার্চ করবে? তা ছাড়া আমাদের ধারণা, অধ্যাপনার কাজে শুধু ছেলে পড়াতেই হয়। গবেষণামূলক কোন কাজ করার মানে হল, অধ্যাপনার কাজে ফাঁকি দেওয়া।

জগদীশচন্দ্র একটু নীরব রইলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—আপনারা রিটায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন। আমি কী করব যদি একটু বলে দেন—

ক্রফট্ সাহেব হেসে উত্তর দিলেন—একদিন আমরাও তোমার বিরুদ্ধে ছিলাম। তোমার চরিত্র বুঝতে পারি নি। প্রথমে আমরা তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি, ভাবলে এখন আমাদের লজ্জা করে। যেভাবে তুমি আমাদের বন্ধুরূপে

পরিবর্তিত করেছ, আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার মৌলিক গবেষণায় সকলকেই বন্ধুভাবে তৈরি করে নিতে পারবে।

জগদীশচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন। এদিকে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে তোলপাড় শুরু হল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইলিকট্রিসিয়ান পত্রিকার একটি সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখলেন—বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের যতগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, নিঃসন্দেহে জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত যন্ত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেই বৃটিশ নেভির সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন স্যার হেনরী ম্যাকসন। তিনি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের কথা পড়লেন। যেভাবে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে স্যার হেনরী জাহাজের মধ্যে একটি যন্ত্র তৈরি করলেন। সেই যন্ত্রের মাধ্যমে জাহাজের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করতে পারলেন অনায়াসে।

ইটালীর অধিবাসী গাগলিয়েমো মারকনি* বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের গবেষণা করছিলেন একই সময়ে। জগদীশচন্দ্র মারকনির আগেই এই গবেষণায় সার্থক হয়েছিলেন, এ কথা সকলের সঙ্গে ফাদার লাঁফো** জোরের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে একখানি চিঠিতে অনুরোধ করে লিখলেন।

"প্রিয় জগদীশ,

আমি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে তোমার 'বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ' বিষয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে বক্তৃতা দিতে চাই, কিন্তু তুমি দয়া করে আমাকে যে যন্ত্রগুলি দিয়েছিলে, সেগুলো ঠিক কাজ করছে না। মারকনির আগে তুমি যে বিনা তারে সংবাদ পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছো, সে বিষয়ে আমি তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমি এই সভায় ছোটলাটকে নিমন্ত্রণ করছি। তুমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে এই সভায় উপস্থিত থেকে, তোমার যন্ত্রগুলির ব্যবহার দেখিয়ে দিতে পার তাহলে খুব ভাল হয়।

একান্তই তোমার—ই. লাফোঁ. এস. জে."

জগদীশচন্দ্র বিলেতে গিয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল পশ্চিম জগতের মনীষীদের সামনে তুলে ধরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কলেজ থেকে তিনি কোন সাহায্যই পান নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘণ্টা অধ্যাপনা করতেন। মাইনের টাকা থেকে গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন।

* গাগলিয়েমো মারকনি = Guglielmo Marconi 1874-1937.

** ই লোফোঁ এস জে = E. Lafont. S. J.

তা ছাড়া রিসার্চের জন্য যে দু' একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেখেছিলেন, তাদেরও মাইনে দিতেন নিজের মাইনের টাকা থেকে। সব খরচ করার পর অবলাদেবীর হাতে যা তুলে দিতেন, তাতে কখনও মাসের তিরিশ দিন চলত না।

অমানুষিক কষ্ট করে সংসার চালাতে হত অবলাদেবীর, তবু হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য করেছেন। চন্দননগর থেকে যাতায়াত করে রিসার্চ করা সম্ভব নয় বলে, কলকাতার মেছুয়াবাজারে বাড়ি নিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন। একটি দিনের জন্যেও স্বামীকে টাকার কথা বলেন নি।

ছোটলাট দেখলেন, এভাবে জগদীশচন্দ্রের জীবনযাত্রা চললে বেশীদিন তিনি রিসার্চ করতে পারবেন না ; অভাবের জ্বালায় অধ্যাপনাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। ছোটলাট বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন, জগদীশচন্দ্রের জন্য যেন একটি নতুন পদ সৃষ্টি হয়। এই পদে তিনি শুধু রিসার্চ করবেন এবং মৌলিক গবেষণাকারী ছাত্রদের সাহায্য করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ মঞ্জুর করলেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি নিয়োগপত্র পাবেন, এ খবরও পেয়ে গেলেন।

জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। সরকার তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছিলেন। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের অধিকাংশই সরকার নির্বাচিত করতেন, ফলে সরকার যা ইচ্ছে করতেন, তাই পাস করিয়ে নিতেন বিভিন্ন মিটিং-এ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিন মিটিং ছিল। অন্য ফেলোদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। অন্য ফেলোরা সরকারের মতানুসারে মত দিলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র নিজের মত ব্যক্ত করলেন। সে মত ন্যায্য মত, কিন্তু সরকারপক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত মত।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর জন্যে যে নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছিল, তা খারিজ হয়ে গেল। নির্ভীক জগদীশচন্দ্র আপন অভিমতে অনড় হয়ে রইলেন।

আবার একটি মিটিং। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সভাতে একটি আলোচ্য বিষয়ে সরকার যেদিকে মত পোষণ করেন, তিনিও যেন সেইদিকে মত দেন।

জগদীশচন্দ্র চিঠি পড়ে মৃদু হাসলেন। ইংরেজ শক্তি দরিদ্র ভারতীয়কে ক্রীতদাসের মত কিনে নিতে চায় আর ভারতীয়রা অকৃত্রিম মনোবল নিয়ে নিজের পথে এগিয়ে চলেছে।

জগদীশচন্দ্র সেই মিটিং-এ গেলেন না। সরকারপক্ষ জগদীশচন্দ্রের ওপর রীতিমত রেগে গেলেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তিনি আলোচ্য মিটিং-এ উপস্থিত হন নি ?

জগদীশচন্দ্র চিঠির উত্তরে সবিনয়ে জানালেন, সরকারের মনোনয়নে তিনি সত্যিই নিজেকে গর্বিত ভাবেন, কিন্তু সরকার যদি ভেবে থাকেন, সরকার যা বলবেন, তিনি নির্বিচারে তাতে মত দেবেন, তাহলে সরকার ভুল করেছেন। দেশের জন্য যা ভাল, শিক্ষার জন্য যা উপকারী, সেই বিষয়েই তিনি মত দেবেন ; সে মত যদি সরকারেরর বিরুদ্ধে যায়, তাতেও তিনি পেছপাও হবেন না। স্বাধীন মত প্রকাশ করলে যদি গভর্নমেণ্ট মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য সম্পাদন করা হচ্ছে না, তাহলে এই পদ থেকে মুক্তি দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রের চিঠি এবং তাঁদের বক্তব্য ছোটলাটের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর মতামত চাইলেন। ছোটলাট জগদীশচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে, তাঁর কঠিন চরিত্রের জন্য সমীহও করতেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বুঝলেন, জগদীশচন্দ্র যা বলছেন, তা ন্যায্য। ছোটলাট জগদীশচন্দ্রের মত অনুমোদন করলেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তারা সে অনুমোদন মেনে নিলেন না। ছোটলাট শিক্ষা অধিকর্তাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে কিছুতেই জগদীশচন্দ্রকে নতুন পদে অধিষ্ঠিত করতে পারলেন না।

ছোটলাট হেরে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাদের কাছে। জগদীশচন্দ্রের জন্যে তৈরী পদ বিলুপ্ত হয়ে গেল আবার।

ছোটলাট জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, তাঁর গবেষণায় ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে, সেইজন্যে তাঁর গবেষণায় যে টাকা খরচ হয়েছে, সেই টাকা সরকার তাঁকে দেবার মনস্থ করেছেন।

জগদীশচন্দ্র বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—সরকারের এই চিঠিতে তিনি সম্মানিত, কিন্তু অতীতের গবেষণায় যে অর্থ খরচ হয়েছে, তা গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন। গভর্নমেণ্টের এই সুবিবেচনার জন্যে সত্যিই তিনি চিরকৃতজ্ঞ।

গভর্নমেণ্ট প্রত্যুত্তরে জানালেন—বেশ। আপনি যা ন্যায্য মনে করে লিখেছেন, তার উত্তরে আমরা কিছু বলতে চাই না, তবে ভবিষ্যতে রিসার্চ করার খরচের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করা হল। আশা করি এবার আপনি আর অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হবেন না।

জগদীশচন্দ্র গ্রহণ করলেন।

ছোটলাট সখেদে জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রান্তে নতুন পদ দিতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখিত। ভবিষ্যৎকাল অনুভব করতে পারবে কত বড় ক্ষতি আজ তারা করল।

জগদীশচন্দ্র ছোটলাটের কাছে বললেন—তিনি বিলেতে যাবেন। তাঁর

আবিষ্কারের পরীক্ষাগুলি পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওঁদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা দরকার।

ছোটলাট কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—ওদেশে গেলে আপনার গবেষণার সুবিধে হবে বটে, কিন্তু এত খরচ করা কি সুবিবেচনার কাজ হবে ?

জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—সরকার কি তাঁকে পাঠাতে পারেন না ?

—না। এ ধরনের ডেপুটেশনে সরকার পাঠাতে পারবেন না।

জগদীশচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন—আপনারা মুখে বলছেন ভারতে বিজ্ঞানসাধনা হোক। কিন্তু মনে মনে তা চান না, এবং ভারতীয়দের ওপর আপনাদের বিদ্বেষ আছে। আমরা যদি সত্যিই কিছু করি, তাতে আপনাদের মন খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা, নমস্কার।

দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় ফিরে আসার জন্য রওনা দিলেন। দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়ি নেমে এসেছেন জগদীশচন্দ্র, এমন সময় একজন দূত ছুটে এসে একখানি চিঠি দিলেন।

জগদীশচন্দ্র চিঠিখানি খুললেন।

স্বয়ং গভর্নর চিঠিখানি লিখেছেন: প্রিয় অধ্যাপক বাসু, আমি আপনাকে ব্যক্তিগত দায়িত্বে ছ' মাসের জন্য ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের ডেপুটেশনে পাঠানো স্থির করেছি। আশা করি আপনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবেন। আপনার ইংলণ্ড যাত্রা যখন খুশী স্থির করতে পারেন।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হেসে চিঠিখানি বন্ধ করে পকেটে রাখলেন। পত্রবাহী দূতকে বললেন—আমার হয়ে আপনি লাটসাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন। আমি কলকাতায় পৌঁছেই এ চিঠির উত্তর দেব।

জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরেই অবলাদেবীকে চিঠিখানি দেখালেন। অবলাদেবী চিঠিখানি পড়ে, আবার স্বামীর হাতে ফেরত দিয়ে মৃদু হেসে বললেন—তোমার আরব্ধ কাজ আরম্ভ হচ্ছে শুধু, শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, জীবনে কোথাও যেন অকৃতকার্য না হও।

জগদীশচন্দ্র পরম আবেগের সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমি জানি, তুমি যতদিন আমার পাশে থাকবে, ততদিন কোন কাজেই অকৃতকার্য হব না। তুমি যত শীঘ্র পার তৈরি হয়ে নাও, আমি ইংলণ্ড যাত্রা করব। আমার আবিষ্কারের কথা পশ্চিমের শিক্ষিত জগৎও শুনুক, দেখুক। তাদের বিশ্বাস হোক, আমরাও বিজ্ঞান জানি, আমরাও ওদের মত বুদ্ধিমান, হয়ত ওদের চেয়েও বুদ্ধিমান।

অবলাদেবী হেসে উত্তর দিলেন—তোমার কথা তো কেউ অবিশ্বাস করছে না।

—তুমি জানো না, ইংরেজরা ভাবে, আমরা পশুর জীবন-যাপন করতে পারি। আমরা যে মানুষ, একথা ওরা মানতেই চায় না। সেই কথাই আমরা বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব।

—নিশ্চয়ই বন্ধু। দরজার বাইরে এক আগন্তুকের কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য মিষ্টি কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য মোহময় কণ্ঠস্বর। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? বাইরে থেকে আবার আগন্তুকের কণ্ঠস্বর।

—নিশ্চয়ই বন্ধু। ভেতরে এস। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র। আগন্তুকের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বসালেন জগদীশচন্দ্র।

আগন্তুক অবলাদেবীকে নমস্কার করলেন। অবলাদেবী প্রতি নমস্কার করে বললেন—আপনার বন্ধু ইংলণ্ডে যাচ্ছেন। সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।

—নিশ্চয়ই যাবেন। পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রমাণিত করতে হবে, আমরাও বিজ্ঞানের আবিষ্কারে সব দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। আপনার যাত্রা জয়যাত্রা হোক।

জগদীশচন্দ্রের প্রাণের বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবেগের সঙ্গে কথাগুলি বললেন।

জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক লণ্ডনে পৌঁছুলেন। ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষা অধিকর্তা জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে চিঠি লিখে পরিচয়-লিপি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন অধ্যাপক বসু যে শুধু একজন অধ্যাপক তাই নয়, তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বহুবিধ কাজ করেছেন এবং করছেন। তাঁকে সর্ব রকম সাহায্য করা গভর্নমেণ্টের একান্ত কর্তব্য।

লণ্ডনে জগদীশচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অধ্যাপক বাসু তাঁর নিজস্ব আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলি দেখিয়ে বিনা তারে যন্ত্র প্রেরণের বিষয় বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে সকলেই এমনভাবে আপ্লুত হয়ে গেলেন যে, ক্লাবে, সংবাদপত্রে পত্রিকায় কেবল জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হতে লাগল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের 'ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ার' পত্রিকা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা উচ্ছ্বাস ভরে প্রশংসা করলেন। শুক্রবার রয়াল সোসাইটি হলে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তিনি পায়ে পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্যালারির শেষ প্রান্তে উঠে অবলাদেবীকে পর্যন্ত ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করে গেলেন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করলেন, বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ একেবারে মৌলিক আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কারের পদ্ধতি যদি পেটেণ্ট করেন, তাহলে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারবেন বসু দম্পতি। জগদীশচন্দ্রের এক আমেরিকান বন্ধু পদ্ধতি পেটেণ্ট করার জন্য ফর্মের সমস্ত কিছু ভর্তি করে দিলেন। তিনি বললেন—তুমি শুধু সই করে দাও। আমি জমা দিয়ে

দিচ্ছি। তুমি পদ্ধতির কথা এত বেশী ভাবে আলোচনা করেছ যে সকলেই এখন এ পদ্ধতি জানে। একবার সময় পার হয়ে গেলে আর পেটেণ্টের দরখাস্ত করা যাবে না; করেও কিছু লাভ হবে না। তুমি যদি পেটেণ্ট নিয়ে নাও, কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবে:

জগদীশচন্দ্র হাসলেন। ফর্মটা ছিঁড়ে ফেলে বললেন—আমরা ভারতীয়। মুনি ঋষির দেশের লোক! আমরা চাই বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা দেশের মানুষের উন্নতি হোক। আমরা টাকার অত লোভ করি না। তা ছাড়া বিজ্ঞান এমন একটি বস্তু যা কখনও কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে থাকা উচিত নয়।

জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এমন নির্লোভ মানুষও এ যুগে জন্মগ্রহণ করতে পারেন! লণ্ডনের উন্নাসিক 'স্পেকটেটর' পত্রিকা জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকাও জগদীশচন্দ্রের পরিশ্রমের কথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দিকে দিকে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের সুখ্যাতি। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের প্রশংসা। বাঙালীর কবি, জগদীশচন্দ্রের প্রাণাধিক বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশচন্দ্রকে সম্মান প্রদর্শন করে লিখলেন:

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠস্বরে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীর মন্ত্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাতেছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

মৃত্যু ! মৃত্যু !! মৃত্যু !!!

বাংলার বুকে সেই সময়ে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে গেল। চির অশান্ত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনাবসান ঘটল ১৮৭৩ সালে। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাঙালী চরিত্রের জীবনধারার অভিভাবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু, মৃত্যু নয়, বঙ্গদেশের ইন্দ্রপতন ঘটল। বাঙলাদেশের সংস্কৃতির আকাশে যেন এক ঝড়ের সঙ্কেত। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইয়োরোপের ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল কয়েকটি কথা: ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইটালীর অধিবাসী মিঃ মার্চিজ গাগ্‌লিয়েমো মারকনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি পেটেণ্ট করলেন, যার নাম দেওয়া হল রেডিয়ো।

লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণায় শুধু মুগ্ধ হন নি, তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস হয়েছিল, জগদীশচন্দ্র যদি সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক সাহায্য পান, তাহলে আশ্চর্য রকমের নতুন একাধিক আবিষ্কার করতে পারবেন। রত্ন চিরকালই রত্নকে চিনতে পারে, সেখানে জাতি-ধর্মের ব্যবধানের বাধা থাকে না, সাদা-কালোর প্রভেদ থাকে না, সেখানে একটি জ্ঞানীর মনের আগুনের স্ফুলিঙ্গে আর একটি মন মুহূর্তমধ্যে জ্বলে উঠে নিজেকে মহৎ থেকে মহত্তর করে তোলে, অপরজনকে মহত্তর জীবনের পথসন্ধান দেয়।

লর্ড কেলভিন থামলেন না। লণ্ডনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলে একযোগে ভারত-সচিবকে একটি অনুরোধ-পত্র লিখলেন: কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চশ্রেণীর ও মহৎ গবেষণার জন্য ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানাগার গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন আমরা মনে করি। ভারত সাম্রাজ্যের উপযোগী একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার গড়ে তোলার জন্যে আমরা আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন, প্রফেসর ক্লিফটন, প্রফেসর ফিটজেরাল্ড, ডাক্তার গ্লাডস্টোন্, অধ্যাপক পয়েন্টিং, স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌সে, স্যার গ্যাব্রিয়েল স্টোক্‌স্, প্রফেসর ফিলভেনাস টমসন, স্যার উইলিয়াম রুকার এবং আরও অনেক অনেক দিকপাল বৈজ্ঞানিকের দল।

ভারত-সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন আবেদনপত্রটি মন দিয়ে পড়লেন। দিকপাল বৈজ্ঞানিকদের একত্র-আবেদন পাঠ করে এটুকু লর্ড হ্যামিলটন বুঝতে পারলেন, জগদীশচন্দ্রের হয়ে যে আবেদনপত্র এসেছে, তাকে তুচ্ছ মনে করলে ভুল করা হবে। লর্ড হ্যামিলটন সেই পত্রটি নিয়ে উপস্থিত হলেন বড়লাট লর্ড এলগিনের অফিসে। লর্ড এলগিনের সামনে লর্ড হ্যামিলটন পেশ করলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের আবেদনপত্র।

লর্ড এলগিন দেখলেন, গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিমত দিয়েছেন সেক্রেটারী-জেনারেল লর্ড হ্যামিলটন।

লর্ড এলগিন অনুমোদন করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। ভারত-সচিব লর্ড এলগিনের ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন বাংলা গভর্ণমেণ্টকে। বাংলা গভর্নমেণ্টের হাত ঘুরে যখন জগদীশচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছুলো চিঠির কাগজ, তখন জগদীশচন্দ্র দেখলেন, তার ওপর লেখা রয়েছে—স্কীমটি প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এক্ষুণি কিছু করার নেই। প্রস্তাবটি ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জগদীশচন্দ্র। এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বপ্ন দেখাও পাপ।

তবু জগদীশচন্দ্র নিরাশ হলেন না। আবার নতুন উদ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

॥ সাত ॥

চঞ্চলিত অণুতে অণুতে

"We, on the other hand, see that Europeans eat without discrimination whatever tney get, have no idea of cleanliness as we have, do not observe east distinctions, freely mix with women, drink wine and shamelessly at a ball, men and women held in each other's arms; and we ask ourselves in amazement, what good can there be in such a nation?"

প্রাচ্যের আদর্শ ধর্ম হিন্দুধর্ম। তারই একনিষ্ঠ সেবক, দেবদূতের মত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে পশ্চিম জাতকে শুনিয়ে চলেছেন, আমাদের মতটা হেয় মনে করছো অতটা হেয় আমরা নই। আমরা ছাই চাপা আগুন। আমাদের ছাই সরাতে দাও, দেখবে আমরা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠব। আমরা আর্য, তোমরা আমাদের যাই বলে ডাক, আমরা আর্য।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জ্বালাময়ী ধর্ম-বক্তৃতায় বিশ্বের লোককে হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে এক নতুন আলো দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বৃটিশের সঙ্গে ভারতীয়দের তফাৎ কোথায় জানো? ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায়। বৃটিশ

জাতি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্রতা করবে। রাজা রানী রাস্তা দিয়ে গেলে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাবে। অত্যন্ত সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সান্ধ্য মজলিসে যাবে; একটি কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করবে না কারুর সম্পর্কে কিন্তু রাজা বা রানী যে-ই এক পয়সা ট্যাক্স চাপিয়ে দেবেন দেশের লোকের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষ কৈফিয়ত চাইবে। তারা বলবে, আমরা নিশ্চয়ই একটা পয়সা দেব, কিন্তু কি জন্যে এক পয়সা চাইছো বলতে হবে। এক পয়সা খরচ করবে কার জন্যে, সে-কথাও বলতে হবে। এই পয়সা খরচ করলে আমাদের কি কি উপকার হবে তাও আমাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে যতক্ষণ না পয়সা লেনদেনের কথা উঠছে, বৃটিশের মত এমন সুন্দর, ভদ্র জাতি আর নেই, কিন্তু যেই এক পয়সার লেনদেনের কথা কেউ জানতে চেয়েছে, অমনি তার পুরো হিসেবপত্তর, লাভ-লোকসানের কথা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছে।

ভারতীয়দের গরিব বল, মূর্খ বল, তারা ভ্রূক্ষেপও করবে না। রাজ-প্রাসাদের বদলে তাদের যদি কোন পাতার কুটিরে, এমন কি পাহাড়ের গুহাতেও বসবাস করতে দিলে ভারতবাসীর মনে কোন রেখাপাত করে না। একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে কোন রকমে দেহ আচ্ছাদন করলেও আমাদের কোন সংকোচ বা লজ্জা হয় না, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করেছ, যে মুহূর্তে হিন্দু ধর্মকে অপমান করেছ, সেই মুহূর্তে আমরা আগুনের মত জ্বলে উঠে সামনে যা পাই পুড়িয়ে ছাই করে দিই। কিছুদিন আগেই তোমরা দেখেছ আমাদের ধর্মের প্রতি তোমরা কটাক্ষ করেছিলে আর তার উত্তর পেয়েছিলে সিপাহী বিদ্রোহের জ্বলন্ত আগুনে।

স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে উদাত্ত মন্ত্রস্বরে ধর্মতত্ত্বের কথা বলে চলেছেন।

মর্ত্যের নবীন বাল্মীকি তাঁর অমর ছন্দগাথায় গেঁথে চলেছেন কাব্যের সুষমা। তখনও পশ্চিমের মানুষ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগাথার স্বর্গীয় সুগন্ধ অনুভব করার সুযোগ পায় নি।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৩ সালে ডি. এস.-সি. হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে কেমিস্ট্রির প্রফেসর হয়ে ফিরে আসা মনস্থ করলেন। তাঁর থিসিস এত ভাল হয়েছিল যে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকেল সোসাইটি তাঁকে ১৮৮৭-১৮৮৮ সালের জন্য সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ সায়ান্স হন আর একজন বাঙালী। তাঁর নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সুকবি শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুর পিতা।

প্রফুল্লচন্দ্রের আগেই জগদীশচন্দ্র দেশে ফেরেন। কলকাতায় ফিরে স্যার

অ্যালফ্রেড ক্রফট ও প্রিন্সিপ্যাল সি. এইচ. টনির সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, সে-কথাও প্রফুল্লচন্দ্রের অজানা ছিল না। কারণ সব কথাই জগদীশচন্দ্র বন্ধুকে লিখতেন। প্রফুল্লচন্দ্র বিলেতে থাকাকালীন প্রফেসর কাম ব্রাউন-এর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে নিলেন। তিনি স্যার চার্লস বার্নার্ড-এর সঙ্গেও দেখা করলেন। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচিতি দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—কলকাতায় ফিরে যাতে একটা ভাল চাকরি পাই, সেজন্যে যদি একটু সাহায্য করেন।

এমন সময় প্রিন্সিপ্যাল মিঃ টনি বিলেতে এলেন ছুটি কাটাতে। টনি স্যার চার্লস বার্নার্ড-এর আত্মীয় ছিলেন। চার্লস্ বার্নার্ড টনিকে প্রফুল্লচন্দ্রের বিষয় ভাল করে বললেন, একে যদি তোমরা ভাল সুযোগ দাও, এ ভবিষ্যতে কেমিস্ট্রির খুব ভাল কাজ করবে।

মিঃ টনি যথারীতি শিক্ষা অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্টকে চিঠি লিখে দিয়ে বললেন—ডক্টর পি. সি রে এডিনবরা ইউনিভারসিটির ডি. এস. সি.। এঁর কেমিস্ট্রিতে বেশ ভাল দখল আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট প্রফেসর পেডলার তাঁর একজন সহকারীর কথা বার বার বলছিলেন। আপনি এই যুবককে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি উপযুক্ত মনে করলে এঁকে ওই পদে বহাল করে দেখতে পারেন, ও কেমন কাজ জানে।

প্রফুল্লচন্দ্র মিঃ টনির চিঠি নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি দেখা করলেন ক্রফ্টের সঙ্গে। ক্রফ্ট টনির লেখা চিঠি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তারপর বেঁকিয়ে চিঠিটা আবার ভাঁজ করে ড্রয়ারে চালান করে বিদ্রূপের সুরে বললেন—যিনি এডিনবরা ইউনিভারসিটির ডক্টরেট, তিনি কেন কলকাতায় এসেছেন চাকরি করতে?

প্রফুল্লচন্দ্র মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—আমার নিজের দেশ বলে।

ক্রফট সাহেব দপ করে জ্বলে উঠলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যে প্যাঁচ খেলেছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গেও সেই একই চাল চাললেন। হিসেব-নিকেশ করে বললেন—এখন মাসে আড়াইশো টাকার চাকরি পেতে পারেন। তাতে যদি ইচ্ছে করেন যোগ দিতে পারেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের আর কোন উপায় ছিল না। অভাবের জ্বালায় যা হোক একটা চাকরি পেলে ইজ্জত বাঁচে। নিরুপায় প্রফুল্লচন্দ্র আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে ঢুকলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সায়ান্স ল্যাবোরেটারী তৈরি হলো। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর জেমস। জেমস নিজের মত করে ল্যাবোরেটারী সাজিয়ে ঠিক করলেন তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে দিয়ে উদ্বোধন করাবেন। সে যুগে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা যত উদার

চরিত্রের ছিলেন, নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন তত হীনপ্রবৃত্তির। লর্ড কারমাইকেল জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন রিসার্চ দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু মিঃ জেমস এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান নি। লর্ড কারমাইকেল এ বিষয়ে জেমসকে আর অনুরোধ করেন নি, করলেও সে অনুরোধ রাখা হবে না। এ কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল। একদিন লর্ড কারমাইকেল সরাসরি একটি চিঠি লিখলেন জগদীশচন্দ্রকে। তিনি অনুরোধ করলেন, যদি সম্ভব হয় জগদীশচন্দ্র যেন তাঁর অসাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কারমাইকেলকে দেখাবার সুযোগ দেন।

জগদীশচন্দ্র চিঠি পেয়ে তার সৌজন্যমূলক উত্তর দিলেন। কিন্তু কোন তারিখ জানাতে পারলেন না, কারণ প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি ছাড়া তিনি তারিখ দিতে পারেন না আর জেমস সাহেব ও চিঠি দেখেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি বলেন—আগে নতুন ল্যাবোরেটারী হোক, তারপর গভর্নরকে আনা যাবে।

জগদীশচন্দ্র কোন কথা না বলে নিজের কাজে মন দিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে জগদীশচন্দ্রের এক প্রিয় ছাত্র তাঁর ঘরে ঢুকে উত্তেজিতভাবে বললেন—স্যার, ব্যাপারটা দেখেছেন ?

—কি ? জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এই দেখুন।

একখানি নিমন্ত্রণপত্র ছাত্রটি জগদীশচন্দ্রের সামনে এগিয়ে দিল। জগদীশচন্দ্র পত্রটি পড়লেন। জেমস সাহেব চিঠি লিখছেন। নিমন্ত্রণপত্র। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি নতুন সায়ান্স ল্যাবোরেটরীর উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন মহামান্য গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। ইতি—আপনার জেমস।

জগদীশচন্দ্র চিঠিখানি পড়লেন। রাগে অপমানে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সে ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে আবার চিঠিখানি দেখলেন।

উদ্বোধনের তারিখ তিন দিন পরে।

জগদীশচন্দ্র মুহূর্তমধ্যে কী যেন ভাবলেন, তারপর খসখসিয়ে একটা চিঠি লিখে ছাত্রের হাতে দিয়ে বললেন—তুমি এই চিঠিটা এক্ষুণি লর্ড কারমাইকেলের সেক্রেটারীর হাতে দিয়ে এস।

ছাত্রটি চিঠি নিয়ে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে গেল।

বিকেলবেলায় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর জেমস হন্তদন্ত হয়ে জগদীশচন্দ্রের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াট ইজ দিস, মিঃ বাসু ? একখানি চিঠি টেবিলের ওপর ধরে জেমস কথাগুলো বললেন।

জগদীশচন্দ্র কিছু না বোঝার ভান করে উত্তর দিলেন—কেন? কি হয়েছে? আমার এক্সপেরিমেণ্ট দেখার জন্যে লর্ড কারমাইকেল বার বার অনুরোধ করছেন। বার বার না বলাটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ, তাই ওই তারিখ দিয়েছি; ওই তারিখেই ওঁকে আমি সমস্ত এক্সপেরিমেণ্টগুলো দেখাব। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দেব। হাজার হোক তিনি আমাদের মহামান্য অতিথি।

জেমসের মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। তিনি করুণকণ্ঠে বললেন—লর্ড কারমাইকেল লিখেছেন, তিনি তোমার এক্সপেরিমেণ্ট দেখার জন্যে কলেজে আসবেন। আমি যেন তাঁর অভ্যর্থনার সব আয়োজন করে রাখি।

—আপনাকে যা করতে বলেছেন, আপনি নিশ্চয়ই তা করবেন: হাজার হোক তিনি আমাদের মহামান্য অতিথি।

—তা তো করব, কিন্তু আমার ল্যাবোরেটারী যে তার পরের দিনই ওপেন হবে, তাতেও যে গভর্নর আসবেন উদ্বোধন করতে।

—তাতে কি হয়েছে?

—পরপর দু' দিন কি করে রিসেপশন অ্যারেঞ্জ করব?

—আপনি কবে ল্যাবোরেটারীর উদ্বোধন করছেন আমি জানি না। আপনি আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই জানান নি। সেইজন্যে আমি কি করে জানব তিনি আমাদের কলেজে আসছেন? তাহলে তো সেই দিনই আমার পরীক্ষাগুলো রাখতে পারতাম।

—এখন কী হবে তাহলে?

—এখন আর করার কিছু নেই। আমার পরীক্ষার দিনেও আপনি গভর্নরকে রিসিভ করবেন, পরের দিন আপনি যখন ল্যাবোরেটারী উদ্বোধন করাবেন, তখনও তাঁর অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। পরপর দু'দিন কেন হল, এ প্রশ্ন যদি মহামান্য গভর্নর করেন, আমি তার উত্তরে বলবো, আপনি আমাকে কিছু না জানানোর জন্যে এই অঘটন ঘটেছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জাঁদরেল সাহেব মিঃ জেমস্ কেঁদে ফেললেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের হাত দু'খানি জাপটে ধরে সকাতরে বললেন—দোহাই বোস, তুমি ও কথা বোলো না, তাহলে নির্ঘাত আমার চাকরি চলে যাবে।

জগদীশচন্দ্র হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—বেশ। তোমার চাকরি যাতে না যায়, সেদিকটা আমি দেখব, তবে ভারতীয়দের মানুষ বলে ভাবতে শেখ। আমরাও মানুষ। আমরাও শিক্ষিত, উন্নত। তোমরাও মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারই শোভা পায়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্.-সি. উপাধি পেলেন ১৮৯৬ সালে। কলকাতার ছাত্রসমাজ তাঁকে আচার্যদেব বলেই

অভিনন্দিত করল এবং জগদীশচন্দ্র বোধহয় সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেন আচার্যদেব আখ্যাকেই।

আচার্য জগদীশ আবার রিসার্চের তপস্যায় মগ্ন হলেন। তিনি কোন বাহ্যিক প্রত্যাশায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাধনা করছেন না, তাঁর একাধিক প্রমাণ দিয়েছেন ইয়োরোপ-ইংলণ্ডের বিভিন্ন জনসভায়। বিভিন্ন গুণী-ব্যক্তিদের সম্মেলনে।

আচার্য জগদীশের চোখে আশ্চর্য স্বপ্ন, অত্যাশ্চর্য চিন্তার স্রোত। তাঁর মন চলে গেছে কোথায় কোন সুদূর অতীতে, সেই ফরিদপুরের হাঁটাপথের উপর, যেখানে মাধব ডাকাতের কাঁধে চড়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেন। দু'পাশে গাছের সারি। লজ্জাবতী লতা, নারিকেল, তাল, শাল হিন্তাল। কোথাও কোস্তা-ধানের সবুজ ক্ষেত। স্পর্শ করলে লজ্জাবতীর পাতাগুলি আপনা থেকে লতিয়ে যেত! মাধবকে প্রশ্ন করত বালক জগদীশচন্দ্র। ডাকাত উত্তর দিত—ভগবানের খেলা।

বাড়ি ফিরে বাবাকে প্রশ্ন করত বালক জগদীশচন্দ্র। বাবা, লজ্জাবতীর লতাগুলিকে স্পর্শ করলেই ওগুলো লজ্জায় লতিয়ে যায়, কিন্তু অন্য গাছের বেলায় কেন হয় না?

বাবার কথাগুলি আজও তাঁর শরীরের মধ্যে শিহরণ নিয়ে আসে। দূর-দূরান্ত থেকে বাবা যেন বলছেন—আমি সঠিক উত্তর দিতে পারব না, তবে এইটুকু বলতে পারি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের বিশ্বাস ছিল, গাছের প্রাণ আছে, আমাদের মতই তারা সমস্ত অনুভূতি অনুভব করতে পারে। আমাদের মতই তারা রাগে, কাঁদে, হাসে। আমাদের মতই তারা লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। আমাদের মতই তাদের বংশবৃদ্ধি হয়, আমাদের মতই তাদের মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্র পাথরের মত নিশ্চল নিস্পন্দ। তাঁর কানে যেন পিতার কথাগুলি স্বপ্নাদেশের মত বেজে চলেছে। ভগবানচন্দ্র পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—লজ্জাবতীর স্পর্শকাতরতা খুব বেশী বলে আমরা বুঝতে পারি। অন্য গাছেও অনুভূতি জাগে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না।

অস্পষ্ট অন্ধকারে ল্যাবোরেটারীর মধ্যে টেবিলের ওধারে জগদীশচন্দ্র স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁর পিতা সামনে দাঁড়িয়েছেন। তেমনি চাদর গায়ে; কোমর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, তার নীচে জমাট অন্ধকার। মুখের ওপর জমাট এক জ্যোৎস্নাময় আলো। তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বর্গীয় বীণাধ্বনি। তিনি আবেগ গম্ভীর স্বরে জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে আদেশের ভঙ্গীতে বললেন —এর প্রকৃত কারণ তুমি বার কর জগদীশ!

জগদীশচন্দ্র মুখ তুলে তাকালেন। কী যেন উত্তর দিতে গেলেন। কিন্তু কেউ নেই। অস্পষ্ট আলোক পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি। অদূরে

রিসার্চ টেবিলের ওপর বুনসেন বার্নার, স্পিরিট ল্যাম্প পুড়ে চলেছে। তিনি ধ্যানমগ্ন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করে বললেন—অনেক রাত হয়েছে আচার্যদেব। বাড়ি চল। বৌঠান একা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

—হ্যাঁ, চল। ল্যাবোরেটারীর ল্যাম্পগুলো নিবোতে নিবোতে জগদীশচন্দ্র উত্তর দিলেন। ল্যাবোরেটারী বন্ধ করতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করলেন। দু'জনে সব বন্ধ করে নামলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—এবার কিসের রিসার্চ করবে?

—বোটানির।

প্রফুল্লচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন—কি বললে? ফিজিক্স থেকে বোটানি?

—হ্যাঁ। ফিজিক্স থেকে বোটানি—পিতার আদেশ!

ফিজিক্স থেকে বোটানি। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ থেকে জড়জীবনের অন্তরে অন্বেষণ! বিদ্যুৎধারা থেকেই শুরু করে আবার ফিরে যাবেন জড়জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কোষে কোষে।

বিদ্যুৎতরঙ্গ নিয়ে যখন জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করতেন, তখন একটা জিনিস করতেন বার বার। কৃত্রিম চোখের সাড়া ক্রমাগত বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দ্বারা স্তিমিত হয়ে যায়। একটা সময় আসে যখন আর সাড়া পাওয়া যায় না। দু'-এক ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে আবার কৃত্রিম চোখ আগের মতই সাড়া দেয়।

একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার এই একই পরীক্ষা লক্ষ্য করেছেন জগদীশচন্দ্র। তাহলে কি প্রাণীর মত জড়পদার্থেরও বাইরে থেকে বার বার আঘাত খেয়ে খেয়ে একটা ক্লান্তি নেমে আসে? তাহলে কি জড়পদার্থের মধ্যেও অনুভূতির স্পন্দন আছে?

আর্টিফিসিয়াল চোখের তারায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আলো পড়লে তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। চোখের মধ্যে যখন তরঙ্গের পরিবর্তন হয়, জগদীশচন্দ্র ভাবলেন, বাইরে থেকে অন্যরকমের উত্তেজনাতেও আণবিক পরিবর্তন ঘটে; বলেই অনুভবের রূপও বদলে যায়।

কিন্তু ভাবা এক জিনিস, আর বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত করা আর এক জিনিস। প্রত্যেকটি গাছ যে সাড়া অনুভব করে, কিন্তু সেই সাড়া সাদা চোখে দেখা যায় না। বৈদ্যুতিক আঘাতের জন্যে পাতা নড়ার কোনটি আঘাতজনিত ঝিমিয়ে পড়া বা উত্তেজিত হওয়া আর কোনটি আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসা। যতক্ষণ না সেগুলি প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ কল্পনা শুধু কবির কল্পনাই থাকবে, বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ হবে না।

কি করা যায় তাহলে?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাড়া বোঝার জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র! কোথায় পাব সেই যন্ত্র? এ যন্ত্র আমাকেই তৈরি করতে হবে। এর উদ্ভাবন আমাকেই করতে হবে।

প্রতিজ্ঞা করলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আর সেই প্রতিজ্ঞাকে সার্থক করে তোলার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

দিনরাত পরিশ্রম করে আচার্য জগদীশচন্দ্র একটি যন্ত্র তৈরি করলেন। গাছের পাতা ওঠানামা করে। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের একটা অংশ হল অ্যালুমিনিয়মের তার। এই তারের এক প্রান্তে গাছের পাতায় অতি সূক্ষ্ম রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধলেন। অন্য প্রান্ত শক্তভাবে অন্য একটি তারের সঙ্গে লম্বভাবে বেঁধে দিলেন। এই তারের সঙ্গে একটা আয়না বেঁধে দিলেন এমনভাবে যাতে আয়নাসুদ্ধ দুটো তার অনায়াসে খেলে বেড়াতে পারে। এছাড়া আর একটি স্থির ছোট গোল আয়না লাগিয়ে দিলেন যন্ত্রের প্রান্তদেশে। যন্ত্রের অন্যদিকে সাড়া আঁকবার যন্ত্র-কাগজ লাগিয়ে দিলেন। এই কাগজ-ফিতে গুটিয়ে রাখার মত রেখে দেওয়া হয়। ঘড়িকল দিয়ে সেই কাগজখানিকে জোরে অথবা আস্তে খোলা যায়।

লজ্জাবতীর লতা স্পর্শমাত্রেই নুইয়ে পড়ল। পাতা যেই নীচের দিকে নেমে গেল, অমনি সুতোর ওপর টান পড়ল। সুতোর ওপর যেই টান পড়ল, আয়নাগুলোর ওপর ছায়া প্রতিফলিত হল। পাতা যেমন ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে গেল, আয়নার প্রতিবিম্বিত আলো তেমনি ডান থেকে বাঁয়ে চলে যাবে, আবার পাতা যখন উঠবে, আলো তখন বাঁ থেকে ডাইনে যাবে।

জগদীশচন্দ্র অনুভূতির উৎস হিসেবে আলোকেই গ্রহণ করলেন। তার প্রধানতম কারণ, আলোর কোন ওজন নেই। হাত দিয়ে স্পর্শ করলে হাতের ওজনের কতটা পাতার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তার হিসেব করা সম্ভব নয়। অন্য কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে অনুভূতির স্পন্দন দিলে তারও ওজন খানিকটা পাতার মধ্যে প্রবেশ করে যাবে, ফলে সঠিকভাবে অনুভূতির স্পন্দন হিসেব করা যাবে না। আলোর কোন ওজন নেই। আলোর স্পন্দন গাছের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করলে স্পন্দনকে সঠিকভাবে ধরে রাখা যাবে জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের মাধ্যমে।

কিন্তু আবার সমস্যা। গ্রাফ্ ধরে রাখার যে কাগজ লাগানো হয়েছিল যন্ত্রের ঘাড়কলের ভেতর, সে কাগজ সাধারণ কাগজ। তাতে পেনসিলের দাগ উঠতে পারে। আলোর দাগ উঠবে কী করে?

আয়নার প্রতিফলিত আলোর রেখাকে চিরতরে ধরে রাখার জন্যে জগদীশচন্দ্র সাধারণ কাগজ বদলে সেখানে ফটোগ্রাফির কাগজ জড়িয়ে দিলেন। ফটোগ্রাফির কাগজের ওপর আলোর রেখা একবার পড়লেই ছবি উঠে যাবে আর সেই ছবি চিরকালের মত ধরা পড়ে যাবে যন্ত্রের ভেতরে।

লজ্জাবতী লতার ওপর আলোর স্পন্দন। পাতা একদিকে নেমে চলেছে, পাতার সঙ্গে লাগানো সুতোর ওপরে টান। সেই সুতোর টানে আয়নার

দোলন। আয়নার ওপর আলোর *প্রতিফলনের রেখা ফটোগ্রাফিক কাগজের* ওপর আপনা থেকেই অঙ্কিত হয়ে চিরকালের প্রমাণ হয়ে পৃথিবীর বুকে রয়ে গেল।

বনচাঁড়ালের গাছের বেলাতেও তাই। একইভাবে স্পন্দনের ছবি আঁকা হয়ে গেল যন্ত্রের কাগজে কাগজে। জগদীশচন্দ্র রোমাঞ্চিত, জগদীশচন্দ্র পুলকিত, তাঁর দেহের অণুতে অণুতে চঞ্চলিত শিহরণ।

জগদীশচন্দ্র চিন্তা করলেন লজ্জাবতী বা বনচাঁড়াল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই অত স্পষ্টভাবে অনুভূতির স্পন্দন যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে, কিন্তু যে-সব গাছের স্পর্শকাতরতা খুব সামান্য, তাদের অনুভূতি তো এ যন্ত্রে বোঝা যাবে না।

জগদীশচন্দ্র যন্ত্রটিকে আবার তৈরি করতে লাগলেন। অ্যালুমিনিয়মের তারের বদলে যে কোন ধাতুর তার দিলেই কাজ হবে। ক্রমশ যন্ত্রটির উন্নতি করতে করতে ম্যাগনিফাইং পাওয়ার এক কোটি গুণ বৃদ্ধি করে ফেললেন। সামান্যতম স্পন্দনও এই যন্ত্রের মধ্যে বিরাট আকার ধারণ করে প্রকাশ করে দেবে। এই যন্ত্রে কাউকে হাত দিতে হবে না। গাছের ওপরে আলোর স্পন্দন পড়বে আপনা থেকে, স্পন্দনের অনুভূতি লেখা হয়ে যাবে আপনা থেকেই। গাছ তার নিজের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দের কথা আপনা থেকে নিজের ভাষাতেই লিখে যাবে। সেই ভাষা দেখতে পাবে পৃথিবীর মানুষ। সেই ভাষা প্রথম পড়ে বুঝিয়ে দেবেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের নাম রাখলেন 'বৃদ্ধিমান'। তারপর রাখলেন কুঞ্চনমান বা শোষণমান। কিন্তু কোন সাহেবই এই নাম উচ্চারণ করতে পারলেন না। জগদীশচন্দ্র বুঝলেন, সাহেবকে বাংলা শেখানো খুব কঠিন কাজ, তাই তাঁর যন্ত্রের নাম দিলেন ক্রেস্‌কোগ্রাফ।

॥ আট ॥

তুমি দীপ্যমান

ক্রেস্‌কোগ্রাফ্‌ যন্ত্র তৈরি করার পর আচার্যদেব আর একটি যন্ত্র তৈরি করলেন, তার নাম দিলেন রেসোন্যান্ট্‌ রেকর্ডার। ক্রেস্‌কোগ্রাফার যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন গাছ, লতা, পাতা প্রাণীজগতের মতই বেড়ে চলে, মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তার বয়স বাড়ছে, ঠিক তেমনি গাছও প্রতিনিয়ত বাড়ছে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেও গাছেরও বৃদ্ধি ঘটছে।

গাছ-লতা-পাতা-বৃক্ষের অব্যক্ত জীবনের কর্তব্যচিহ্ন যদি গাছ নিজেই এই পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পারে, তা হবে সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ, পৃথিবীর মানুষকে বিশ্বাস করানোর একমাত্র উপায়।

তিনি আবিষ্কার করলেন রেসোন্যাণ্ট রেকর্ডার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্য জগদীশচন্দ্র গাছ-লতা-পাতার ক্রিয়াপদ্ধতি দেখতে পেলেন। সেকেণ্ডের সহস্র ভাগ সময়ের মধ্যে গাছের স্নায়ুকেন্দ্রের পদ্ধতি ফুটে উঠতে লাগল এই আশ্চর্য যন্ত্রের ছবির কাগজে।

জগদীশচন্দ্র আবার একটি যন্ত্র তৈরি করলেন সে যন্ত্রের নাম দিলেন অসিলেটিং রেকর্ডার। অসিলেটিং রেকর্ডার যন্ত্রের মাধ্যমে বনচাঁড়াল গাছের পাতার ওঠানামার দাগ দেখতে পেলেম। জগদীশচন্দ্র আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলেন আমরা যেমন হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার দাগ দেখতে পাই, ঠিক তেমনি দাগ উঠেছে বনচাঁড়াল পাতার ওঠানামার জন্যে! ও দাগগুলো তাহলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার দাগ? লতা-পাতা-গাছেরও তাহলে হৃদ্‌যন্ত্র কাজ করে? স্নায়ুতন্ত্র আমাদের মতই সজাগ এবং অনুভূতিশীল?

নির্বাক জীবনকে সবাক করে তুলতে হলে, গাছের জীবনমৃত্যুর ইতিহাস উদ্ধার করতে হলে যন্ত্রের সাহায্যে গাছের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেই লেখায়, সেই লিপিতে মানুষের কোন হাত থাকবে না, কোন কারুকার্য থাকবে না। গাছ নিজের হাতে লিখবে। প্রত্যেকটি অনুভূতির ছবি আপনা থেকেই যন্ত্রের মাধ্যমে আঁকা হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি গাছ-লতা-পাতার বিভিন্ন চরিত্রের ছবি ফুটে উঠবে যন্ত্রের মাধ্যমে, গাছের বৃদ্ধি, গাছের যন্ত্রণা, গাছের কান্না, গাছের হাসি ফুটে ওঠে আচার্যদেবের নিজস্ব আবিষ্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে। একটি শিশুবৃক্ষ একটু

একটু করে বাড়ে। সে বৃদ্ধি এত অল্পমাত্রায় যে খালি চোখে তা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যন্ত্রের ভেতর সে বৃদ্ধির ছবি উঠে যায়। গাছকে খেতে দিলে, গাছের ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয়, আপাত দৃষ্টিতে সেই পরিবর্তন ধরা না গেলেও যন্ত্রের মাধ্যমে তা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। শিশুবৃক্ষকে আহার না দিলে কি হয়? মানুষের মনে অনাহারের সময় যে প্রতিক্রিয়া হয়, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে গাছকেও অনাহারে রাখলে। গাছকে ওষুধ খাওয়ালে কি হয়? বিষ খাওয়ালেই বা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে? বিষের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কি অন্য রকমের প্রতিক্রিয়া হয়? সে প্রতিক্রিয়ার কি ছবি তোলা যায়?

অনুভূতি অনুভব করার জন্যে, শারীরতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। আমাদের যদি কেউ চিমটি কাটে, তাহলে কি ভাবে সেই অনুভূতি অনুভব করা যায়? প্রথমে চিমটি কাটার মধ্যে যে উত্তেজনাজনিত আঘাত আছে, তা অ্যাফারেন্ট নার্ভের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। মস্তিষ্ক থেকে আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে ধরনের কাজ করতে হবে, সেই ধরনের উত্তেজনা মোটর নার্ভের ভেতর দিয়ে যেখানে আঘাত ঘটেছে, সেখানে উপস্থিত হয় এবং চিমটির সাড়া দেয়। চিমটি কাটা থেকে সাড়া দেবার সময় পর্যন্ত ক্ষণিকের বিরতি আছে, যাকে ইংরিজীতে লেটেণ্ট পিরিয়ড বলা হয়।

গাছের অনুভূতি ক্রিয়ার মধ্যে কি এমনি লেটেণ্ট পিরিয়ড আছে?—আছে—জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন আছে। এক সেকেণ্ডের শতভাগের একভাগ হলেও আছে। এই লেটেণ্ট পিরিয়ড নির্ভর করে আঘাতের চরিত্রের ওপর, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর।

মৃদু আঘাতজনিত উত্তেজনায় অনুভূতি একটু দেরিতে প্রকাশিত কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে অনুভূতি প্রকাশের সময়কাল সেই মুহূর্ত। শীতে জৈব-জীবন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। আমরাও হয়ে থাকি। শীতের মধ্যে স্টিমুলেশন একটু জোরে না হলে, মানুষ সে স্টিমুলেশন অনুভব করতে পারে না, অনেক সময়ে স্টিমুলেশন অনুভব করতে দেরি হয়। আমরা যখন ক্লান্ত অবসন্ন থাকি, তখন যে কোন অনুভূতি গ্রহণ করতে দেরি হয়। অনেক সময় অনুভূতি গ্রহণ করার সামর্থ্যও থাকে না। আচার্য জগদীশচন্দ্র তিলতিল করে, প্রতি ক্ষেপে, একটু একটু করে প্রমাণ করলেন, মানুষের বেলাতেও অনুভূতির নিয়ম যেমন, গাছের বেলাতেও অবিকল তাই। আমাদের বেলায় শুধু বেশি, গাছের বেলায় কম। আমাদের অনুভূতি প্রকাশের উচ্ছ্বাস বেশি, গাছের কম, তাই সাধারণ চোখে আমাদের উচ্ছ্বাস বুঝতে পারি, গাছ-গাছড়ার অনুভূতির উচ্ছ্বাস বুঝতে পারি না।

৮৫ অপার সারকুলার রোড
২রা মার্চ, ১৯০০

সুহৃদ্বরেষু,—

গত মঙ্গলবার দিন Belvedere-এ গিয়াছিলাম। Sir J. Woodburn আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratory তে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদের কার্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন। আপনারা আমার Paris Congress-এ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে সে কথা উল্লেখ করিলাম।

Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় Secretary of State-এর হাত।

গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্তেই Director-এর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—"I am informed you had an interview with Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exhibition, to attend a meeting of European scientists. May I ask you to inform of the reasons for making your request to His Honour?"

এরূপ দুরাশা করিবার reason কি, ইহার explanation কি দিতে হইবে জানি না।

আপনার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

চিঠিখানি পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ। মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল! সাহেবের জাত ওরা। ওরা চিরকালই ভারতীয়দের হেয়জ্ঞান করে আসছে। ভারতীয়রা নতুন কিছু করতে পারে, মৌলিক আবিষ্কার যে তাঁদের মস্তিষ্কেও আসে, এ ধারণা সাহেবরা কখনও কল্পনা করতে পারে না। সাহেবরা চাকরি করতে এদেশে আসে, তাঁদের মনোবৃত্তিও চাকরের মত। তাঁরা ভাবতেই পারেন না, ভারতবাসী কোন মৌলিক কাজের কথা, ইয়োরোপে গিয়ে, তাদের ভাষাতে, তাদের সামনে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বকথা বলতে পারবেন। বরং বলতে গিয়ে লোক হাসাবে। তার ফলে ওপর থেকে কৈফিয়ত চাইবে, কেন এই আহাম্মক লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল সুসভ্য দেশে। ব্যস্, তার চাকরি খতম!

রবীন্দ্রনাথ চিঠি বারবার পড়লেন। তাঁর প্রাণের বন্ধু তাঁকে চিঠি

লিখেছেন। প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্রের যাওয়া একান্ত উচিত। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং পদ্ধতি পশ্চিম জগতের বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে না ধরলে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাদের দেশ এমন হতভাগ্য দেশ যে, যে কাজের প্রশংসা ইউরোপ ইংলণ্ড আমেরিকা করবে, সে-কাজের বাহবা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশও দেবে, অন্যথায় ব্যঙ্গ আর বক্রোক্তি।

বন্ধুবরকে যেভাবে হোক প্যারিস পাঠাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে অর্থ সংগ্রহ করে অবলা দেবীর কাছে গিয়ে সমস্ত টাকা দিয়ে বললেন—বৌঠান এই নিন অর্থ। আপনি এবং বন্ধুবর প্যারিস কংগ্রেসে যাবার সমস্ত আয়োজন করুন। আমার স্থির বিশ্বাস, উনি জয়লাভ করে আসবেন।

কবিবরের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ছোটলাটও ঐকান্তিকভাবে চেস্টা করলেন জগদীশচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠানোর জন্যে। প্যারিস বিশ্ব-প্রদর্শনীতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পেশ করলে সারা বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে, একথা রবীন্দ্রনাথের মতই তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার উডবার্ন বিশ্বাস করতেন।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেস।

ভারতের প্রতিনিধি বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। বিয়াল্লিশ বছরের যুবক। কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা চুল। ঋজু চেহারা। চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। পরনে প্যাণ্ট, গলাবন্ধ কোট। তাঁর বক্তৃতার বিষয়ঃ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া।

আন্তর্জাতিক বক্তৃতাসভায় লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গা নেই। সেই সম্মেলনে উপস্থিত এক সন্ন্যাসী। তিনি দেখছিলেন এক এক করে অন্য অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা সভামঞ্চে উঠে তাঁদের বক্তব্য পেশ করছেন। তাঁরা নিজের নিজের দেশের গৌরবকাহিনী শ্রোতাদের শুনিয়ে চলেছেন। সন্ন্যাসীর মনে একটা দীর্ঘশ্বাস। ভারতজননী কি একজনও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন নি, যিনি দেশমাতৃকার গৌরবকাহিনী বর্ণনা করতে পারেন ?

এমন সময় ভারতের প্রতিনিধির ডাক এল। সন্ন্যাসী দেখলেন এক সৌম্যমূর্তি বাঙালী সন্তান মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন। বক্তা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, মঞ্চের উপর টেবল। পেছনে মঞ্চের গায়ে ছবি টাঙানো। বিষ প্রয়োগের অনুভূতি, শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদের অনুভূতি, ধনুষ্টঙ্কারের রিঅ্যাকসন, বিভিন্ন উত্তাপের বিভিন্ন মাত্রার বৃক্ষের সাড়া, তার সঙ্গে স্নায়ু ও পেশীর এবং তার সঙ্গে তুলনা করা ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখাচিত্রাবলী।

সন্ন্যাসী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, বাঙালী বিজ্ঞানী মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনে টেবিলের ওপর পরীক্ষার যন্ত্রপাতি।

বাঙালী সন্ন্যাসী অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বাঙালী বৈজ্ঞানিক তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায়, সহজ সরল সাবলীলভাবে তিনি প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সহাস্য পরিহাস করে সমস্ত আবহাওয়াকে সুন্দরতর, সহজতর করে তুললেন।

জগদীশচন্দ্র তার মৌলিক গবেষণার বিষয় সুনিপুণভাবে বর্ণনা করলেন। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বাঙালীর আশ্চর্য মৌলিক বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে স্তব্ধ, মুগ্ধ, আশ্চর্যান্বিত। তাদের কল্পনাশক্তির বাইরে যে ধারণা ছিল, সে ধারণারও সীমারেখা পার হয়ে গেছে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-কাহিনী। বৃক্ষ-লতার যন্ত্রণা, প্রাণীজীবনের যন্ত্রণার মতই এক; গাছপালার স্নায়ুস্পন্দন, হৃদস্পন্দন, যন্ত্রণাস্পন্দন মানুষের মতই দৃশ্যমান; প্রভেদ কেবল, এই স্পন্দন খালি চোখে দেখা যায় না, এ স্পন্দন দেখার যন্ত্রে অনুভূতিশীল যন্ত্রের প্রয়োজন। আমি সেই যন্ত্র আবিষ্কার করেছি এবং সেই যন্ত্র আপনাদের সামনে এই টেবিলের ওপরে।

টবের মধ্যে একটি গাছ ছিল; গাছের গায়ে বিষ প্রয়োগ করলেন জগদীশচন্দ্র। লতার দেহের সঙ্গে যন্ত্রের যোগ করে দিলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন বিষের জ্বালায় লতা ছটফট করছে, আর সেই ছটফটানির গ্রাফ্ ক্রমাগত উঠে যাচ্ছে যন্ত্রের কাগজে। গাছের যন্ত্রণা, লতার যন্ত্রণা, আপনা থেকেই লতার ভাষায় লেখা হয়ে যাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে।

এবার একটি ব্যাঙকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করলেন। ব্যাঙটিকেও এবার বিষ দিলেন। ব্যাঙের শরীরেও যে যন্ত্রণা হচ্ছিল, তার ছবি ক্রমাগতঃ উঠে যাচ্ছিল বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নিজের তৈরি যন্ত্রের গায়ে।

দুটি ছবি নিয়ে জগদীশচন্দ্র উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদের সামনে মেলে ধরলেন। দুটি গ্রাফ একেবারে এক। কোনটি ব্যাঙের যন্ত্রণা আর কোনটি লতার যন্ত্রণা গ্রাফ দেখে কেউই সাব্যস্ত করতে পারলেন না। জগদীশচন্দ্র আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—একটুকরো টিনেও যদি বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহলেও অনুরূপ গ্রাফ আমার যন্ত্রে উঠে যাবে। আমি আমার যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছি প্রাণীর অনুভূতির মত উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে। উভয়ের অনুভূতিই এক। একজনের অনুভূতি জোরালো বলে সাদা চোখে দেখা যায়, অন্যজনের অনুভূতি খুব মৃদু বলে সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না।

আমার বক্তব্যকে আরও নিশ্চিত করার জন্যে বিপরীত পরীক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

জগদীশচন্দ্র লতার গায়ে, ব্যাঙের দেহে এবং টিনের ওপরে ওষুধ প্রয়োগ করলেন, যাতে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রত্যেক

বৈজ্ঞানিক পরম বিস্ময়ে অবলোকন করলেন লতার যন্ত্রে যে ধরনের গ্রাফের ছবি উঠেছে, ঠিক তেমনি ব্যাঙের যন্ত্রে উঠেছে। টিনের যন্ত্রেও উঠেছে।

লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন—জগদীশচন্দ্র এক স্বর্গীয় কণ্ঠস্বরে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন—স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সময় শরীরের মধ্যে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তার ছবিও আমার যন্ত্রে আঁকা হয়ে গেছে। আপনারা স্বচক্ষে দেখুন—প্রাণীর দেহতেও যে ধরনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে, লতার দেহতেও ঠিক সেই ধরনের স্পন্দন-রেখা সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে মানুষের মতই, প্রাণীজগতের মতই, উদ্ভিদ-জগতের অনুভূতিশক্তি পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

এ সম্পর্কে যদি কোন সাধুজনের সন্দেহ থাকে বা প্রশ্ন থাকে, অনায়াসে করতে পারেন, আমি সবিনয়ে তার উত্তর দেব।

সভাস্থল নির্বাক নিস্পন্দ।

বীর সন্ন্যাসীর বুক গর্বে ফুলে ফুলে উঠছিল। তিনি ভারতমাতাকে প্রণাম জানালেন, তিনি বললেন, জননী জন্মভূমি! তুমি ধন্য! আজ তোমার যে সন্তানকে দেখলাম, তাকে যদি না দেখতাম, আমার জীবন বৃথা হত। তুমি ধন্য ভারতমাতা. তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর—

সেই সন্ন্যাসী ভারতবর্ষের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

জগদীশচন্দ্র প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেন। ৩১শে আগস্ট, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখলেন:

"একদিন প্যারিসে Congress-এর President হঠাৎ আমাকে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি কিছু কিছু বলেছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congress-এর Secretary আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But Monsieur, this is very beautiful (but এর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষ দিন আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য Secretary এবং President-এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।"

লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার আয়োজন হল। প্রিন্স ক্রপটকিন সভায় উপস্থিত হলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অত্যাশ্চর্য গবেষণার ফলাফল দেখার জন্যে। লর্ড র‍্যালি সেদিন উপস্থিত থাকতে পারলেন না। স্যার মাইকেল ফস্টার জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় নিজে উদ্‌যোগী হয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন। মাইকেল ফস্টার ছিলেন কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শারীরতত্ত্ববিদ। তাঁর ফিজিওলজির অগাধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি সায়ান্স কংগ্রেস মিটিং-এ জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট গ্রাফ নিয়ে মাইকেল ফস্টারের কাছে যান, তিনি গ্রাফখানি দেখে বললেন—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এ রকম গ্রাফ আমরা অর্ধ শতাব্দী ধরে দেখে আসছি।

—এ গ্রাফগুলো কিসের যদি দয়া করে বলেন? বিনীতভাবে জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

—কেন মাংসপেশীর সংকোচনের।

—ঠিকই বলেছেন। এই গ্রাফটি মাংসপেশীর সংকোচনের, অন্য আর একটি গ্রাফ দেখিয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন। পরক্ষণেই দৃপ্তকণ্ঠে কথা শেষ করলেন জগদীশচন্দ্র—আপনি যে গ্রাফটি দেখছেন, সেটি একটি টিনের, আর দ্বিতীয় গ্রাফটি একটি লতার—

চমকে উঠলেন মাইকেল ফস্টার। সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর দীর্ঘ বিজ্ঞানীজীবনে এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। এই অবিশ্বাস্য মৌলিক আবিষ্কারের কথা সারা বিশ্বে প্রচার একান্ত প্রয়োজন। রয়াল সোসাইটিতে পাঠ করা দরকার, রয়াল ইনস্টিটিউটে পাঠ করা দরকার। বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা দেখুক : বুঝুক, বিচার করে দেখুক, ভারতীয়রাও কোন অংশে হেয় নন।

রাত ন'টায় সভার দরজা খোলা হল। সভাপতি অবলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, দেহে অলঙ্কার। ভারতীয় নারীত্বের প্রতিমূর্তি।

ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে করতালির সহৃদয় অভ্যর্থনা জানালেন দর্শক-বৃন্দ। জগদীশচন্দ্র ধীরকণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন। যে-বক্তৃতা এর আগেও দিয়েছেন তিনি, তারই পুনরাবৃত্তি। এখন আর জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই, অস্বচ্ছতা নেই। অকপটে, সরলতম পদ্ধতিতে কঠিনতম বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে গেলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

আচার্যদেব যতক্ষণ বক্তৃতা দিলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে বসে রইলেন। সভাশেষে অধিকাংশ ব্যক্তি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ করে বিদায় নিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র ব্র্যাডফোর্ড-এর সভায় বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতাতেও জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কারের কথা সবিস্তারে বললেন, তার সঙ্গে, নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো পূর্বের মতোই দেখালেন।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগ পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। প্রথমে আলোর তরঙ্গ উত্তাপ সৃষ্টি করে উদ্ভিদের গায়ে আঘাত সৃষ্টি করছে। এই অংশটুকু বিজ্ঞানের হিসেবে পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। সেই আঘাত উদ্ভিদের দেহের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, আর তারই জন্য উদ্ভিদের

শিহরণ এবং যন্ত্রের গায়ে শিহরণের কম্পিত অঙ্কন। আবিষ্কারের এই অংশ শারীরতত্ত্ব বা ফিজিওলজির অন্তর্গত।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলির সত্যতা পদার্থবিদেরা স্বীকার করে নিলেন। তাঁরা এককথায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, কিন্তু শারীরবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন। জগদীশচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমি পদার্থবিদ হলেও শারীরতত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোক প্রাণীর চোখের ওপর পড়লে ফিজিওলজি-ক্যাল যে-সব উপসর্গ দেখা যায়, আমার তৈরি কৃত্রিম চোখের ওপর পড়লেও একই রকমের উপসর্গ বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে কেন আপনারা বলছেন না আমার আবিষ্কার শারীরবিদ্যার ধর্ম মানছে না?

পদার্থবিদরা বললেন—আমরা আপনার কথা মানছি। কিন্তু—

—আমরা মানছি না। শারীরতত্ত্ববিদেরা গম্ভীর কঠিন স্বরে বললেন—আপনার আবিষ্কার শারীরতত্ত্বধর্মীয় নয়, অতএব এই আবিষ্কার সম্পূর্ণ ভুল! আপনার ভুয়ো তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি না।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সাল।

জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রাণের বন্ধু, জীবনের পথ-প্রদর্শক ও উপদেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখলেন:

"বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার Stereoscope-এ MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a fine research in hand, go on with it."

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন--"Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others--all very important."

আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night. We thought your time is being wasted in Iudia, and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here and there are many candidates. But there is just now a very good appointment and should you care to accept it, no one else will get it."

এখন বলুন কি করি?

একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিযাছি—যাহা কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ

amateurish রকমের চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশী লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?"

একই বছরের ৫ই অক্টোবর তিনি আবার একটি চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন:

"আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিয়োরী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্ধ-পরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে-দিকে দেখি, সে-দিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্ম-জন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোনটা ছাড়িয়া কোনটা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।"

ব্র্যাডফোর্ডের বক্তৃতাগুলো পুরোপুরি শেষ হল না। তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন জগদীশচন্দ্র। ডিসেম্বর মাসের এগারো তারিখে তাঁর অপারেশন হল।

আবার রিসার্চ! আবার গবেষণা। এবার শারীরতত্ত্বের দিক থেকে। প্রাক্তন অধ্যাপক লর্ড র‍্যালি এবং স্যার জেমস ডিউয়া সাহায্য করতে লাগলেন সব রকমের। রয়াল ইনস্টিটিউশনের পরীক্ষাগারে জগদীশচন্দ্র নতুন করে আবার রিসার্চ শুরু করলেন।

আবার নিজের হাতে যন্ত্র বানালেন জগদীশচন্দ্র। এবার তিনি এমন যন্ত্র তৈরি করলেন যাতে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনুভূতির সমস্ত রেখা আপনা থেকেই যন্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।

১৯০১ সালের ৬ই জুন জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখালেন। প্রথমটা সামান্য দ্বিধা হয়েছিল, পরক্ষণেই সে দ্বিধা কেটে গেল, তাঁর সুললিত আবেগমণ্ডিত কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকটি পরীক্ষা ব্যক্ত করে গেলেন। পনেরো মিনিট! মাত্র পনেরো মিনিট পরে সমস্ত হলঘর আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক হোউস জগদীশচন্দ্রকে বললেন—আমি যখন এক একটা পরীক্ষা দেখছিলাম, তখন তার প্রত্যেকটার, কি দোষ আছে, ত্রুটি আছে দেখছিলাম—আর ভাবছিলাম, আপনি থামলেই আপনাকে জেরা করে জর্জরিত করে দেব।

কিন্তু পরক্ষণেই আপনি নিজেই নিজের ত্রুটি খণ্ডন করে দিচ্ছিলেন এবং বক্তৃতার শেষে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আপনার বক্তব্য ত্রুটিহীন।

জগদীশচন্দ্রের জয় আবার ঘোষিত হল। সকলেই অভিনন্দন জানালেন, অনেকে জয়ধ্বনি করলেন। স্বয়ং সভাপতি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন ঃ

"It seems to me that your experiments make it clear beyond doubt that all parts of plants—not merely those which are known to be mobile—are irritable, and manifest their irritability by an electrical response to stimulation. This is an important in advance, and will, I hope, be the starting point further researches to elucidate what is the nature of molecular condition, which constitutes irritability and the nature of the molecular change induced by a stimulus. This would, doubtless, lead to some important generalisation as to the properties of matter; not only living matter, but non-living matter as well."

মিঃ স্যাণ্ডারশন এবং তাঁর কয়েকজন সহকারী জগদীশচন্দ্রকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—তুমি ফিজিক্স-এর লোক। ফিজিক্স-এর ব্যাপার নিয়ে যে-সব কথা বলেছ, বেশ ভালই বলেছ, আমাদের মনে হয় তার মধ্যেই থাক। ফিজিওলজির মধ্যে মাথা গলাবার চেষ্টা করছ কেন?

জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তার কপি পাঠিয়েছিলেন রয়াল সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। রয়াল সোসাইটিতে কোন প্রবন্ধ পাঠালে, তাঁদের প্রবন্ধ-নির্বাচক কমিটি প্রবন্ধটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেন, তারপর সবদিক থেকে প্রকাশযোগ্য হলেই তবে প্রকাশ করা হয়।

স্যাণ্ডারশন এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের অভিযোগে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধটি কমিটি বিচার করে দেখলেন না। ভবিষ্যতে বিচার করবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলমারিতে বন্ধ করে রেখে দিলেন।

অধ্যাপক হোউস (Howes) জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজেই সর্বত্র ঘুরে ঘুরে এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের কথা বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীর সামনে তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। সেখানে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ভাইনস-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি হোউস-এর সব কথা শুনে বললেন—এক কাজ কর, আমরা বিখ্যাত পণ্ডিত হোরেস ব্রাউন আর হাওয়েসকে এই সম্পর্কে বলি। তাঁদের নিয়ে গিয়ে মিঃ বাসুর পরীক্ষাগুলো দেখাবার ব্যবস্থা করি। ওঁরা যদি সন্তুষ্ট হন, তাহলে হয়ত কিছু কাজ হতে পারে।

সেই কথাই ঠিক হল। জগদীশচন্দ্র এবং ভাইনস পণ্ডিত ব্রাউন এবং হাওয়েস-এর কাছে গেলেন। ওঁরা দু'জনে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে বললেন—আপনারা এই বাঙালী বৈজ্ঞানিককে একটু সাহায্য করুন, দেখবেন, ইনি নিজেকে অসাধারণরূপে প্রমাণিত করবেন।

—বেশ। তোমরা যখন বলছ, একটা সুযোগ দেবার চেষ্টা করব।

জগদীশচন্দ্র আবার পরীক্ষা দিলেন। আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা দিলেন। যে-বক্তৃতা বার বার দিয়েছেন, যে-বক্তৃতা শুনে অসাধারণ মনীষীবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেও না-বোঝার ভান করেছেন, তাঁদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টায় আবার জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন হোউস আর ভাইনস-এর আন্তরিক অনুরোধ আর প্রচেষ্টায়।

বক্তৃতা শুনলেন। অধ্যাপক পণ্ডিত হোরেস ব্রাউন বক্তৃতা শুনে বললেন —অদ্ভুত, অপূর্ব ও অসম্ভব!

একটু থেমে আবার বললেন—রয়াল সোসাইটি তোমার প্রবন্ধ প্রকাশ না করুক, কোন ক্ষতি নেই। তুমি লিলিয়ান সোসাইটিতে এসে তোমার পরীক্ষাগুলো দেখাও। তোমার প্রবন্ধের বিরোধী শারীরবিদ্যা বিশারদদের আমরা নেমন্তন্ন করব। তাঁদের যা বক্তব্য সামনাসামনি বলুন; আলোচনা করে তখনই একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

জগদীশচন্দ্র নীরবে বসে রইলেন। আবার কি ভাগ্যদেবী তাঁর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্যে মৃদুহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন? বেশ! দেখা যাক ভাগ্যের পরিহাস!

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি জগদীশচন্দ্র লিলিয়ান সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

ভাগ্যদেবী আবার তাঁকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন স্বহস্তে।

চোর আমাদের দেশে আছে, আবার ওদের দেশেও আছে। ওরা নাকি সুসভ্য, ওরা নাকি শিক্ষিত? ওদের দেশের জ্ঞানীগুণীরা সার্টিফিকেট না দিলে, আমাদের দেশের কোন মানুষই নাকি জ্ঞানী হতে পারবে না। অন্ততঃ পৃথিবীর লোক তাকে জ্ঞানী বলে স্বীকার করবে না, যদি তাকে পশ্চিম জগতের মানুষ জ্ঞানী বলে স্বীকার না করে নেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি রয়াল সোসাইটিতে দিয়েছিলেন প্রকাশের জন্যে। রয়াল সোসাইটির একজন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বিষয়গুলি নিজের নামে চালিয়ে দেবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন—এ সব আবিষ্কার তাঁর। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে অনুকরণ করছেন।

বাঙালী জগদীশচন্দ্র সাহেবের নীচতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কী

করবেন ভেবে পেলেন না। কি উত্তর দেবেন তাও তিনি ঠিক করে উঠতে পারলেন না। তিনি নিঃশব্দে বসে রইলেন।

প্রফেসর হোউস একথা জানতে পারলেন। তিনি লিলিয়ান সোসাইটির সভ্য, আবার রয়াল সোসাইটিরও সভ্য। তিনি অধ্যাপক ভাইনস-এর সঙ্গে দেখা করলেন। অধ্যাপক ভাইনস সমস্ত ব্যাপার শুনে বললেন—সে কি কথা? প্রফেসর বাসু তাঁর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন আগেই রয়াল সোসাইটিতে জমা দিয়েছেন। আমরা সে প্রুফ অন্ততঃপক্ষে ছ'মাস আগে দেখেছি।

—তাহলে আমাদের একটা বিবৃতি দেওয়া খুবই দরকার। না হলে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওই চোরে চুরি করে নেবে?

—নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত এবং আজই দেওয়া হোক।

প্রফেসর ভাইনস এবং প্রফেসর হোউস যুক্তভাবে বিবৃতি দিলেন। তাঁরা বললেন, এই মৌলিক আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রের, কারণ দীর্ঘদিন পূর্বেই জগদীশচন্দ্র প্রবন্ধটি রয়াল সোসাইটিতে জমা দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি প্রকাশ হয় না, আলমারিতেই বন্ধ থাকে। আমরা প্রবন্ধটির প্রুফ কপি অন্ততঃপক্ষে ছ'মাস আগে পাঠ করেছি।

যিনি এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজের বলে দাবি করছেন, তিনি কোনভাবে চুরি করে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন এবং সেই প্রবন্ধ থেকে আংশিক প্রকাশ করে নিজের আবিষ্কার বলে ভুয়ো দাবি করবার চেষ্টা করছেন। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি এ আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রের মৌলিক আবিষ্কার এবং সমস্ত সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

অবশেষে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

॥ নয় ॥

সাধুবাদধ্বনি

"………এই ভয় যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে যে, তিনি যদি কোথাও এতটুকু অসফল হন, তাহলে তাঁর স্বজাতীয়রা শিক্ষালাভের অধিকারী বলে আর বিবেচিত হবে না। তিনি আমাকে বললেন—সকলেই জানে, আমাদের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের নিখুঁত বিচারের শক্তিও আছে, অধ্যবসায়ও আছে।

এ কথা তিনি যখন আমাকে বলেছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন, তাঁর শেষ দিকের আবিষ্কারের কথা লিখে ফেলার চেষ্টা করছেন।……"

চিঠিখানির লেখিকা ভগিনী নিবেদিতা, লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জগদীশচন্দ্র যখন দৈহিক এবং মানসিক যুদ্ধে ক্লান্ত অবসন্ন, তখন তাঁর মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিস্টার নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের শরীর অসুস্থ, মনের ওপরও প্রচণ্ড ধকল। এখনও আরব্ধ কাজ শেষ হয় নি। এখনও শারীরতত্ত্ববিশারদের কাছে প্রমাণিত করতে হবে তাঁর আবিষ্কারের তত্ত্বকথা। কিন্তু যে ছুটি নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে জগদীশচন্দ্র এসেছিলেন, সে ছুটি প্রায় ফুরিয়ে গেল। ছুটির মেয়াদ যদি না বাড়ে, তাহলে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই দেশে ফিরে যেতে হবে। একবার দেশে ফিরে গেলে, আর কখনও এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

জগদীশচন্দ্র ইণ্ডিয়া অফিসে গেলেন। তিনি অনুরোধ করলেন ছুটি বাড়িয়ে দেবার। অফিসের কর্মকর্তারা বললেন—অসম্ভব। এ ধরনের কোন নজির নেই, অতএব এভাবে ছুটি দেওয়া যায় না!

—আমার এক বছর ছুটি পাওনা আছে। জগদীশচন্দ্র জানালেন।

—সে ছুটি এখানে পাওনা নেই। ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তা বললেন—সে ছুটি ভারতে পাওনা আছে। সে ছুটি যদি ইচ্ছে করেন পেতে পারেন, তবে সেজন্যে আপনাকে ভারতে ফিরে গিয়ে মঞ্জুর করে আবার আসতে হবে।

—আপনারা ভারতের কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখুন, আমি তো বৈজ্ঞানিক ডেপুটেশনে এসেছি।

—বেশ। আমরা খোঁজ করব। তবে, আপনার রিসার্চের বিষয়ের কাগজপত্রের কপি আমাদের কাছে রেখে যান; আমরাও খোঁজ-খবর নিয়ে

দেখি আপনার সাবজেক্ট কেমন, আর সে বিষয়ে ভারত সরকারকে রেকমেণ্ড করে পাঠাতে পারি কিনা ?

জগদীশচন্দ্র কথাগুলির যুক্তি অনুধাবন করলেন। তিনি তাঁর রিসার্চের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির একটা করে কপি ইণ্ডিয়া অফিসে জমা দিয়ে চলে এলেন।

ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তারা কাগজগুলি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শারীরবিদ্যা-বিশারদদের কাছে। শারীরতত্ত্ববিদেরা জগদীশচন্দ্রের মতবাদকে খুব সুনজরে দেখেন নি, তাই তাঁরা মন্তব্য করলেন, এ সব পরীক্ষা এমন কিছু মৌলিক নয়, যার জন্য ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে অযথা ভদ্রলোককে এখানে থাকতে হবে।

ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তারা এই রিপোর্ট পেয়ে, জগদীশচন্দ্রের দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে রাখলেন। জগদীশচন্দ্রকে কোন উত্তর দিলেন না।

ছুটির মেয়াদ যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখন জগদীশচন্দ্র ইণ্ডিয়া অফিসে এলেন। অফিসার যেন চিনতেই পারেন নি এমন ভাব দেখিয়ে বললেন—আপনি কে ?

জগদীশচন্দ্র মনের রাগ মনে চেপে নিজের নাম বললেন।

—ও! সেই যে ভদ্রলোক, যিনি ছুটির মেয়াদ বাড়াবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন। শুনুন মশায়—আপনার ওসব রিসার্চের বুজরুকি অনেক শুনেছি। আমরা আপনার কাগজগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম। রিপোর্টে জানতে পেরেছি ওগুলো সব বস্তাপচা কাগজ: রিসার্চ না হাতি। কাগজগুলো নিয়ে যান, আর যেদিন ভারতে ফেরার কথা, সেই দিনই ফিরবেন। একটি দিনও বাড়তি এখানে থাকতে পারেন না।

জগদীশচন্দ্র নিজের কাগজগুলো গুছিয়ে ফাইলে বেঁধে ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন—আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এদেশ ছেড়ে যাব না। বুঝলেন ?

—বুঝলাম !—লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েই অনুভব করল কি কথা সে শুনেছে। আঁৎকে উঠে অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করল—কি বললেন ?

—আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এ দেশ ছেড়ে যাব না—কথাগুলো একইভাবে ইস্পাতের মত কঠিন কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলেন জগদীশচন্দ্র।

—কিন্তু আপনার চাকরি চলে যাবে যে ?—অফিসার প্রায় শিউরে উঠল।

—জানি আমি। এ সম্পর্কে আমি নিজেই গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখছি। হয় আমার ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিন, নয় আমাকে চাকরি থেকে রেহাই দিন।

জগদীশচন্দ্রের কথাবার্তার ধরণ দেখে অফিসারের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, এ লোকের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে জগদীশচন্দ্রকে বলল—আপনি দয়া করে আমার নামে কিছু লিখবেন না। তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে। লিখবেন আমি আপনার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছি, চা-কফি খাইয়েছি—

জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শুনলেন না, তার আগেই উঠে চলে গেলেন, নিজের কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে।

জগদীশচন্দ্র ভারত সরকারকে সরাসরি চিঠি লিখলেন এবং ভারত সচিব ছুটির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে মঞ্জুরী চিঠি দিলেন। সেই চিঠি পেয়ে জগদীশচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে নিজের বিজ্ঞান তপস্যায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির পরীক্ষাগারে জগদীশচন্দ্র নতুনভাবে, আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন।

জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন ঃ

"জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্যপথযাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত কথা ও কাহিনী জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে লিখলেন ঃ

"সত্যরত্ন তুমি দিলে পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।"

রিসার্চ !

আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রিসার্চের মধ্যে। গাছপালার স্পন্দন, রোদন, বেদন ঠিক মানুষের মতোই। তিনি বক্তৃতায় তার প্রতিপাদ্য বিষয় সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন, এ বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল।

শুক্রবার বক্তৃতার দিন ধার্য হল। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রাণের বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন ১৯০১ সালের ১৭ই মে লণ্ডন থেকে ঃ

লণ্ডন, ১৭ই মে, ১৯০১

বন্ধু,

বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics এবং Chemistryর দুরুহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব ? আর Experimentগুলিও অতি কঠিন। কতকগুলি ফল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তারপর একটি ঘটনা হইল, সে কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপুরের সময় একেবারে

নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল; তোমাদের এত দিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য নির্মূল হইবে, এ কথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য unscientific ঘটনা ঘটিল।

হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি।' তারপর মুহূর্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছু ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না। যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল।

হিন্দুর সূক্ষ্ম বুদ্ধি একবার patronising রূপে পূর্বে শুনিয়াছি, আমি আমার সেই জাতীয় গুণের জন্য আজ অহঙ্কার করিব। কারণ সেই পূর্ব-পুরুষদের গুণে বঞ্চিত হইলে আমি এত তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতাম না।

আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্যে অভিভূত হইয়াছি, কে আমাকে যেন এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে! তবে হিন্দুর practical বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও Electrician এ দেখিবে।

আমার বক্তৃতার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না "There is money in it. Let me take out a patent for you, you do not know what money you are throwing away." ইত্যাদি। অবশ্য "I will only take half share in the profit—I will finance it." ইত্যাদি।

এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই।

দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার

তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistant-এর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

আমার বক্তৃতা এখনও প্রকাশ হইবে না, কারণ Royal Society আমাকে তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। They made a special case, for they never accept anything read before any other society. সেদিন যত physiological expert-রা থাকিবেন। Sir Michael Foster নিজে আমার paper communicate করিবেন। আমি experiment করিয়া দেখাইব।

তবে আমার সম্মুখে বহু বাধা আছে। প্রথম—commercial interest. অনেক patent আমার কার্য দ্বারা ও আমার নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে অকর্মণ্য হইবে। দ্বিতীয় যাঁহারা Coherer theory বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন। তৃতীয়—phsiologist-রা জীবন বলিয়া একটা নূতন অতি মহৎ একটা কিছু বুঝেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান mere physics, এ কথা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। চতুর্থ—কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু তটস্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

Dr. Waller, যিনি জীবনের শেষ লক্ষণ বাহির করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় মর্মপীড়িত হইযাছেন। সুতরাং আমাকে একাকী এত বিপক্ষের সঙ্গে যুঝিতে হইবে। কি হইবে জানি না।

অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল জগদীশচন্দ্রকে। তিনি বক্তব্যের কাগজগুলি পেশ করলেন রয়াল সোসাইটিতে; কিন্তু তাঁরা সাদা মনে মেনে নিতে পারলেন না। কালা বৈজ্ঞানিকের আশ্চর্য আবিষ্কারের বক্তব্যসম্ভার। তাঁরা বললেন—জমা দাও, বিচার করে দেখি, তারপর মতামত জানাব।

আবার জমা দেওয়া। আবার যদি চুরি হয়ে যায়। যদি তাঁর নামের বদলে, অন্য কারুর নামে লেখাগুলো ছেপে বার হয়ে যায়? এর আগেও তো একবার হবার উপক্রম হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও মতামতগুলি পরপর সাজিয়ে দুটো বই ছাপিয়ে ফেললেন। প্রথম বইখানা: Response in the Living and Non-living.

শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একইভাবে প্রকাশমান। বিশ্বের বাহ্যিক শক্তির ঘাত

প্রতিঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটে, আর সেই বদলে যাওয়া অণুগুলি, দেহের অণুগুলিকে আক্রমণ করে, সেইজন্যে দেহের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দেখা দেয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শক্তির সামান্য অংশ প্রাণীজীবনে প্রবেশ করে, সামান্য অংশ উদ্ভিদজীবনে প্রবেশ করে। সচল প্রাণীজীবনে যে শক্তিটুকু প্রবেশ করে, তারই প্রকাশে প্রাণীর জীবনস্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। আগের বৈজ্ঞানিকরা ভাবতেন প্রাণীজীবনের এই শক্তি প্রাণীর দেহের মধ্যেই তৈরি হয়, আর এই ভুল ধারণার জন্যই যত গোলমাল।

যাঁদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল না, তাঁরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছেন। বিজ্ঞানাচার্যের ১৭ই মে ১৯০১ সালের কবিকে লেখা চিঠির শেষাংশ পড়লেই এ কথা ছবির মত ফুটে ওঠে।

তবে যাঁহাদের কোন self-interest নাই, তাঁহারা অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন, তবে তাঁহারা বলেন, "You must remember that the greatest discovery of the last century—the mechanical equivalent of Heat by Joule was rejected by the Royal Society as unscientific; but twenty years after the Royal Society published the same paper in their transactions. You have brought forward a great discovery having far-reaching consequences. Have you the courage and persistencey to fight for it and force it to be universally accepted? You who see it so oleanly alone can do it; there is none else who can take up your work. If you leave it in its present state, it will be lost.

কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য করিতে পারি তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটি দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় নাই!

জগদীশচন্দ্র তাঁর ফিজিওলজির মতবাদ ক্রমশ জয়লাভ করতে শুরু করল। বিশ্বের বুকে যে অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তি সদাসর্বদা বিরাজ করছে, তারই খানিকটা প্রাণীজগতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণীজগতের অনুভূতি সৃষ্টি করছে। খানিকটা শক্তি উদ্ভিদজীবনের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্ভিদের অনুভূতি সৃষ্টি করে; সেই বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে ধাতুর ওপরও স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্রমশ শারীরবিদদের অতীত ধারণা বদলে যেতে থাকল।

বিজ্ঞানাচার্য রবীন্দ্রনাথকে চিঠির শেষাংশে লিখেছিলেন:

"—আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি—Sir William Crooks বলিলেন যে, Royal Institution হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে, তখন যেন শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই। "I have scarcely heard anything so grand."

Sir Robert Austen, the greatest authority on metals আহ্লাদে অধীর হইয়া আমাকে বলিলেন, "I have all my life studied the properties of metals. I am happy to think that they have life."

তারপর বলিলেন, সে কথা আমাকে আবার শুনিতে দিন। তারপর বলিলেন, "Can you tell me whether there is a future life—what will become of me after my body dies?"

তোমার
জগদীশচন্দ্র বসু

আবার সংগ্রাম!

বুদ্ধিমত্তার এ যুদ্ধে বাঙালী যদি জিততে না পারে, চিরকালের জন্য তাকে পরাজয় বরণ করতে হবে।

শুধু রিসার্চ করলেই হবে না। একগুঁয়ে ভাবে আমি যা বলছি, তাই ঠিক আর বিরুদ্ধবাদীরা বেঠিক বলছে এ কথা বলে যাওয়ার অর্থ গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁরা অবিশ্বাস করছেন, তাঁদের বোঝাতে হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো তাঁদের সামনে দেখিয়ে দিতে হবে, তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে।

জগাই মাধাইকে চোখ রাঙিয়ে কিছু লাভ হয় নি—মিষ্টি কথা, অহিংসার কথা, হিংসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন শুনেছিল, তখনই অহিংসা মন্ত্রের ওপর বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। ভালবাসতে হবে!

জগদীশচন্দ্র প্রাণের আবেগে, যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন। কোন সময়ে লণ্ডন, কোন সময়ে প্যারিস, কোন সময়ে রয়াল সোসাইটি, কোন সময়ে বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বৃষ্টি, কোন সময়ে সন্দেহাকুল বৈজ্ঞানিকের ভ্রূকুটি মেশানো প্রশ্নের উত্তর। সমস্ত ভালমন্দ, আলো-আঁধার, প্রশংসা-নিন্দা মিলিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে অবিরত সাধুবাদধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। জগদীশচন্দ্র নিজেই নিজের জীবনের মূল্য উপলব্ধি করলেন যেন—

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65, Cornhill E. C.
12/2/1902

বন্ধু,

কয়েকজন বিখ্যাত Physiologist-এর থিওরি বোধহয় আর টেকে না, সুতরাং তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বাধা দিবেন। আমার একখানা পুস্তক প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার পূর্ব কার্য সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক পত্রে বিশেষ প্রশংসা হইতেছে—সর্বপ্রধান আমেরিকান Engineering কাগজে—Leader-এ।

A field of inquiry of most extraordinary interest has been open by Dr. J. Chandra Bose ইত্যাদি তিন কলমে!

অদৃশ্য মানবিক তরঙ্গের সংঘাত ও তজ্জনিত বিবিধ অদ্ভুত কাণ্ড ও সেই সংগ্রামের autographic ইতিহাস! আমি আর কি বলিব? আমি এ জীবনে কিছু শেষ করিতে পারিব না।

বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর-চাপা দিলে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।

আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

ইউরোপের একজন প্রধান Physiology-তে অগ্রণী Burden Sanderson-এর নাম শুনিয়াছ। Sanderson এবং Waller এই দুইজন Physiology-র উচ্চ সিংহাসন অনেককাল যাবৎ নির্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Society-তে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাকে দেখাই যে নির্জীব জন্তুরও responsiveness একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, "আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয়, কিন্তু that ordinary plants should give electric response is simply impossible. It cannot be, আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metal, though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use our physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর এই সব phenomena এক সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন physiologists-এর প্রাণপণ চেষ্টায় conspiracy of silence হইল। কারণ আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্তী, একবার সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম

না। এ বিষয়ে একেবারে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম কারণ, "Whom are we to believe—physiologists—or a young physicist who comes all of a sudden to upset all our convictions? সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতিমধ্যে Linnean Society-র President Prof. Vines-এর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক vegetable physiologists-এর মধ্যে সর্বপ্রধান। আর Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্বপ্রধান Society.

Prof. Vines একদিন Prof. Hornes-কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, "I wish Huxley had been living now, he would have found the dream of his life fulfilled."

তারপর Vines as President of Linnean Society, আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত Physiologists-Botanist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত।

১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি?

একেবারে নিরুত্তর। তারপর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন যে we have nothing but admiration for this wonderful piece of work.

President ও অনেকে সাধুবাদ করিলেন।

ইতি—

।। দশ ।।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অফ সায়েন্স। মাসিক আড়াইশো টাকা মাইনেতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপক পেডলারের সহকারী হিসেবে।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের দেবদূত। রসায়নশাস্ত্রের একান্ত সেবক। কখন ডিপার্টমেন্টে কাজে ঢোকেন আর কখন যে বেরোন নিজেও বুঝতে পারেন না। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। গায়ে চাদর। কোন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন, কোন সময়ে প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন হিন্দু সমাজে বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছিল। ইতিহাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে, হিন্দু সাম্রাজ্যের ওপর যবনিকা নেমে আসে।

হর্ষবর্ধনের পর মুসলমান রাজত্বের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বুকে যে বিজ্ঞানের চর্চা হত, তার সবকিছুই লুপ্ত হয়ে গেল। দীর্ঘদিন মুসলমানেরা ভারতের বুকে রাজত্ব করেছে। তাদের রাজত্বকালে বিজ্ঞানের চর্চা হয় নি বললেও ভুল হবে না। চর্চার অভাবে ক্রমশ দেশ থেকে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বিলীন হয়ে যায়।

প্রফুল্লচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস অতীতকালের শাস্ত্র ঘাঁটলে তার মধ্যে থেকে এমন কিছু আবিষ্কার করা যাবে, যা বর্তমানকালের পশ্চিম জগতের বিজ্ঞানীরা জানেন না।

প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটারী। ছোট্ট অপরিসর ঘর। ছেলেদের কাজ করতে খুব অসুবিধে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রফেসর পেডলারকে একদিন বললেন—প্রিন্সিপ্যালকে বলে ল্যাবোরেটারীর ঘর একটু বড় করে দিন।

পেডলার বললেন—আমি বার বার একথা বলছি, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল ভ্রূক্ষেপই করছেন না। কি করা যায় বলতো?

প্রফুল্লচন্দ্র চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন—ঠিক কাল দুপুরবেলায় প্রিন্সিপ্যালকে আমাদের ল্যাবোরেটারী দেখাবার নেমন্তন্ন করুন। বাকী যা করবার আমি করব।

—দেখো রায়। প্রিন্সিপ্যালকে খারাপ কথা কিছু বলে ফেলো না। তুমি

তো মিঃ টনিকে চেনো—দুম্ করে কি খারাপ কথা বলে দেবে, কে জানে?

—আমি কথা দিচ্ছি টনি সাহেবের সঙ্গে একটি কথাও বলব না। প্রফুল্লচন্দ্র আশ্বাস দিলেন।

পরদিন প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের নিয়ে কেমিস্ট্রির ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন প্রতিদিনের মত। টনি সাহেবকে নিয়ে পেডলার সাহেব ল্যাবোরেটারী ঘরে ঢুকলেন, সেই মুহূর্তে একটি ছাত্র ফিসফিস করে প্রফুল্লচন্দ্রকে জানাল—স্যার। মিঃ টনি এসে পড়েছেন পেডলার সাহেবের সঙ্গে।

প্রফুল্লচন্দ্র ফিসফিসিয়ে ছাত্রটিকে উপদেশ দিলেন—যে রি-অ্যাকশন করতে বলেছি, সেটাই শুরু কর।

একটি টেস্ট টিউবের রি-এজেণ্ট একটি ফ্লাস্কের মধ্যে রাখা রি-এজেণ্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। দম বেরিয়ে আসার অবস্থা। প্রচণ্ড কাশি, নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট!

টনি সাহেব মুখে রুমাল ঢাকা দিয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করলেন কিন্তু রি-এজেণ্টের ঝাঁঝে দু' চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল। নিরূপায় সাহেব বাইরে এসে মিঃ পেডলারকে বললেন—হোয়াট ইজ্ দিস্? এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি মরে যেতাম।

পেডলার সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত বুঝতে পারলেন। ছাত্রদের জন্য সুন্দর ল্যাবোরেটারী করে তোলার আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হতেই ডক্টর রায় এমন ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন, যার গন্ধে প্রিন্সিপ্যাল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মাথা চুলকে পেডলার উত্তর দিলেন—এই রকম কষ্ট আমরা রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত করছি। রোজই তো কিছু না কিছু ঝাঁঝালো রি-অ্যাকশন্ করতে হয় আমাদের।

- নো, নো, ইট কাণ্ট বী—মিঃ টনি পরম দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে আদেশ দিলেন—আজ থেকেই ল্যাবোরেটারী ভেঙে নতুন ল্যাবোরেটারী তৈরী করা হোক, যাতে ছেলেরা আর তোমরা ভালভাবেই রিসার্চ করতে পার।

নতুন ভাবে কেমিস্ট্রির ল্যাবোরেটারী তৈরী হল। প্রফুল্লচন্দ্র ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত রিসার্চ করে চলেন নতুন বিজ্ঞানাগারে। মড়ার মাথার খুলি, নানা রকম পশুর হাড় এনে পোড়াতেন প্রফুল্লচন্দ্র। হাড় পোড়ানো ছাই ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ফসফেট। ক্যালসিয়াম ফসফেট মানুষের স্নায়বিক দৌর্বল্যে ব্যবহার করা হয় এবং নার্ভের দুর্বলতা অস্থিভস্ম খেলে তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তাঁর কথা কেউ শুনতে রাজী নন। কে মশায় হাড়-পোড়ানো ছাই খাবে? যত সব বুজরুকী! নিজে খেয়ে দেখুন না।

প্রফুল্লচন্দ্রের কানে কথাটা যেতেই তিনি নির্বিকারভাবে হাড়-পোড়ানো ছাই ল্যাবোরেটারীতে সকলের সামনেই খেতে শুরু করলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী সাধক। কোন সংস্কারে আবদ্ধ ছিল না তাঁর মন। গরুর পায়ের হাড় পুড়িয়ে তার ছাই যেমন নির্বিকারভাবে খেয়েছেন, মানুষের মাথার খুলি পুড়িয়ে তার ছাই ঠিক একইভাবে খেয়েছেন : কোন কুসংস্কারে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখেন নি ; ছাত্রদের সঙ্গে যে প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠা সম্ভব কি-না প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যবহার না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

বিকেলবেলায় ছাত্রদের নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ স্কোয়ার-এর পাশে বেড়াতেন আর গল্প করতেন। অধিকাংশ গল্পই বিজ্ঞান-সম্বন্ধে। অতীতকালে হিন্দুযুগে কেমিস্ট্রির যে উৎকর্ষ সাধন ঘটেছিল, তার বিষয়েও অনর্গল গল্প বলতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর দৃঢ় ধারণা ভারতবর্ষে কেমিস্ট্রি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং বর্তমানকালের গবেষণা সেইদিকে ধাবিত হলে নতুন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকবে।

সাধক প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র, দেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র আরম্ভ করলেন এমন ধরনের রিসার্চ, যার ফলাফলের ওপর দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নীরোগ হয়ে উঠতে পারে। তিনি ঘি আর সরষের তেলে ভেজাল দেবার পদ্ধতি ও পরিমাণ ধরার বিভিন্ন উপায় আবিষ্কারের কাজে লাগলেন। দোকানে দোকানে গিয়ে এলোমেলো ভাবে ঘি তেলের স্যাম্পেল নিয়ে ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষা করে দেখলেন। একদিন নয়, দু'দিন নয়—এক মাস নয়—দু মাস নয়—দীর্ঘ তিন বছর রিসার্চ করে সমস্ত ফলাফল প্রকাশিত করে দিলেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম দিলেন ঃ

On the Chemical Examination of Certain Indian Foodstuffs, Part I. Fats and Oils.

প্রফুল্লচন্দ্র নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের পূজায়। কাজের সময়ের কোন হিসেব নেই পাগল প্রতিভার। ভোরবেলায় দেখ, ল্যাবোরেটারীতে কাজ করছেন প্রতিভাধর প্রফুল্লচন্দ্র, দুপুরবেলায় দেখ একইভাবে কাজ করছেন, রাত্রিবেলায় দেখ পরিবর্তন নেই। ভারতবর্ষের মাটিতে যে ধাতু আছে, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সম্পদ, সোনার চেয়েও দামী, হীরের চেয়েও উজ্জ্বল।

প্রফুল্লচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমাগত কাজের কথা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল এমনভাবে যে নিদ্রাহীনতা রোগ পাকাপাকিভাবে আঁকড়ে ধরল প্রফুল্লচন্দ্রকে।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শে তিনি দিনকতকের জন্যে দেওঘরে বেড়াতে গেলেন।

সেখানে প্রতিবেশী এবং নিত্য আলাপী হিসেবে পেয়ে গেলেন তৎকালীন বঙ্গদেশের রত্নপ্রতিভার সমষ্টি। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কীর্তিমান। রাজনারায়ণ বসু, অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র, দেওঘর হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশায় যোগেন্দ্র নাথ বসু, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা ছিলেন প্রধান। সময়ে অসময়ে তাঁরা গল্প করতেন এবং অধিকাংশ গল্পই জ্ঞানের। যে কোন সাধারণ মানুষ ওঁদের আলোচনা থেকে যে জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন, সেই জ্ঞানই তাঁর ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে থাকবে।

প্রফুল্লচন্দ্র একটু সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটারী যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার ডাক না শুনে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না, তাই আবার কাজে মন ডুবিয়ে দিলেন।

স্যার টমাস হল্যাণ্ড জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়াতে চাকরি করতেন, তার সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে জিওলজির লেকচার দিতেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন—তুমি আমাকে কিছু কিছু ধাতু দিও। আমি পরীক্ষা করে দেখব, নতুন কিছু পাওয়া যায় কি-না। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্যেই স্যার টমাস প্রায়ই নানা রকমের ধাতু পাঠিয়ে দিতেন, আর পাগল প্রতিভা সেই ধাতু নিয়ে নাড়াচাড়া করত দিনরাত ল্যাবোরেটারীর লম্বা কাচঘেরা ঘরে।

হঠাৎ সেদিন!

স্যার টমাসের পাঠানো পারদ ধাতু নিয়ে কাজ করছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। পারা প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতুর ব্যবহার শুরু করেন বুদ্ধের চিকিৎসক মহামতি জীবক। তারপর বিভিন্ন রকমের ধাতুবিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুযুগে। রসায়নশাস্ত্রবিদ নাগার্জুন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে নালন্দায় গিয়ে মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন বিভিন্ন বিদ্যার! নাগার্জুনই ভারতের শেষ বৈজ্ঞানিক। শেষ বৈজ্ঞানিক-আলোর প্রদীপ।

এ কি!

হলদে গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন জমা হচ্ছে টেস্ট টিউবের নীচে। একটু একটু করে ডাইলুট নাইট্রিক অ্যাসিড মেশাচ্ছেন ঠাণ্ডা শীতল মার্কারি ধাতুর সঙ্গে। কিন্তু একি! হলদে হলদে ক্রিস্ট্যালগুলো কি? প্রথমে প্রফুল্লচন্দ্র ভাবলেন ক্ষারজাতীয় কোন পদার্থ নীচে গুঁড়ো হয়ে জমা হয়েছে, পরক্ষণেই তাঁর মাথায় এল, তা কি করে হবে? নাইট্রিক অ্যাসিডের মত অ্যাসিডের সান্নিধ্যে কি করে বেসিক সল্ট জমা হবে?

মুহূর্তের মধ্যে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের স্নায়ুপ্রান্তগুলি সোজা তীরের মত

তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। তিনি আবার টেস্ট করলেন। আবার পেলেন। যতবার টেস্ট করেন, ততবারই একই পদার্থ পান।

পদার্থের বিশ্লেষণ করলেন বার বার। একেবারে নতুন পদার্থ। এর আগে এই রাসায়নিক পদার্থ কেউ তৈরি করতে পারেন নি। পদার্থের নাম মারকিউরাস নাইট্রাইট।

রিসার্চ! রিসার্চ! রিসার্চ!

প্রফুল্লচন্দ্রের রিসার্চ পেপার একশ চল্লিশটিরও বেশী জার্নালে প্রকাশিত হল। পৃথিবীর দিকে দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়জয়কার। নতুন পদার্থটির বিষয় ১৮৯৬ সালের জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত হল। রস্‌কো ডিভার্স, বার্থেলট, ভিক্টর মেয়ার প্রভৃতি অসাধারণ জ্ঞানী রসায়নবিদেরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কারে গর্বিত হয়ে বললেন—"By his discovery of the method of preparation of this compound (Mercurous Nitrite) Dr. P. C. Roy has filled up a blank in our knowledge".

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রফেসর আর্মস্ট্রং সম্মানিক আখ্যা দিলেন 'the Master of Nitrites'.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী। মনে-প্রাণে বাঙালী। যদিও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, যদিও বিলেত যাবার আগে কাঁটা-চামচ নিয়ে টেবলে বসে লাঞ্চ ডিনার খেতে শিখেছিলেন, তবু তিনি মনে-প্রাণে বাঙালী। তিনি বলেছিলেন বাঙালীকে বাঁচতে হলে তাকে ব্যবসায় করতে হবে, শুধু বাবুগিরি করলে চলবে না। তাকে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি জানতে হবে, তাকে ওষুধ তৈরি করতে হবে। ডাক্তারখানায় ওষুধ তৈরি করে সেই ওষুধ বিক্রি করলে মুষ্টিমেয় ডাক্তার আর রোগীর লাভ হবে, দেশের জনসাধারণের কোন লাভ হবে না। নতুন ধরনের ওষুধ তৈরি করতে হবে, নতুন ধরনের ওষুধ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে।

পৃথিবীর মানুষের জন্যে বাঙালী বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র লিখলেন হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি আর বিশ্ব-বিখ্যাত রসায়নবিদ প্রফুল্ল বাঙালীর জন্যে গড়ে তুললেন বেঙ্গল কেমিকেল্‌স।

যে রাতে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়, সে রাতে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, এবং রাত কত গভীর তাঁর অজানা ছিল। একজন পুরনো দাসী ঘরে ঢুকে চীৎকার করে কেঁদে উঠল—"ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।"

"তখনই বউ ঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে, এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে,

অস্পষ্ট আলোকে, ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ যেন বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে, ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।...

...কিন্তু, আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসে পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।"

শিশুকাল থেকে মনুষ্যজীবনের গুণাবলী মণিমুক্তো বিন্দু বিন্দু ভাবে আহরণ করে, একটি চারাবৃক্ষ কখন মহাকাশচুম্বী মহীরুহে পরিণত হয়েছিল একথা মহাসমুদ্রের এ কূলে ও কূলে কোন মানুষেরই কল্পনার সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। শিশুকালের শিক্ষারম্ভে যার সূচনা, ভৃত্যরাজক শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে মনের আকাশে সীমাহীন কল্পনার বিস্তার। ওরিয়েণ্টাল স্কুলের বিচিত্র শাস্তি প্রথা, নর্মাল স্কুলের পরিবেশ, শ্রীকণ্ঠবাবু, কবিতা রচনারম্ভ। বালকের মনে অহরহ যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি, তারই সঞ্জীবিত, অযত্নে গড়ে উঠেছিল মহাকবির কবি মানস। অনুভূতি প্রকাশের অদম্য-স্পৃহা অদম্যতার যন্ত্রণা। সৃষ্টির যন্ত্রণায় মনের রেখায় রেখায় কল্পনার আলপনা, কোনসময়ে সে আলপনা রঙীন ফুলের পাপড়িতে চিররঙীন. কোন-সময়ে সে আলপনার গায়ে গায়ে প্রদীপের বিন্দু বিন্দু আলোর মালা আবার কোনসময়ে সেই আলপনার গায়ে আঁধার অম্বরের প্রচণ্ড ডম্বরুর গর্জন।

রচনাসৃষ্টির সঙ্গে মৃত্যুশোকের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। জন্ম-সৃষ্টি-মৃত্যু একই সুতোয় গাঁথা তিনটি ফুল। একটিকে অস্বীকার করে অপরটির ব্যঞ্জনা সম্ভব নয়ঃ "এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি-দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোনদিন তলব পড়িবে, এবং কোন উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথমে যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়।"

জন্ম থেকে সৃষ্টি। কাব্যসত্তা ক্রমশঃই বিকাশ লাভ করে এক অসামান্য মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা তাঁর কাছে বেশ দুর্বোধ্য ছিল আর সেইজন্যেই তার রসগ্রহণে একটি অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। "গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি কৌতূহল বোধ করতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের তলায় দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রবেশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"

অক্ষয়বাবুর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ এক ইংরেজ কবির কাহিনী শুনেছিলেন। কবির নাম চ্যাটার্টন। কবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করে কবিতা রচনা করতেন, যে কেউ ধরতেই পারতেন না আলোচ্য কবিতাটি চ্যাটার্টনের না সত্যিই কোন সুবিখ্যাত প্রাচীন কবির। এই কবি মাত্র ষোল বৎসর বয়সে আত্মহত্যায় জীবনাবসান করেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে এই কাহিনীটুকু গভীর রেখাপাত করে। আত্মহত্যার ম্লান ইতিহাসটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি, কিন্তু প্রাচীন কবির অনুকরণে কবিতা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা অসাধারণ হয়ে উঠল এবং কবির মনে আশ্চর্য গভীর মোহবিস্তার করেছিল।

একদিন দুপুরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা।

"সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম—

'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে।'

লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম ; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল : "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

একদিন কবি তাঁর এক বন্ধুকে বলিলেন—"সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।"

কবি বন্ধুর কোন কথা না শুনেই, কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন। কবিতাগুচ্ছ শুনতে শুনতে শ্রোতা এমন উদ্বেল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, যে তিনি

বললেন—"এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডী-দাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

কবি নিজের কবিতা সৃষ্টির খাতা দেখিয়ে শ্রোতার কাছে প্রমাণ করে দিলেন, এ সব রচনা কখনও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হতে পারে না; এ কবিতার স্রষ্টা ভানুসিংহের ওরফে রবীন্দ্রনাথের।

ভানুসিংহ থেকে রবীন্দ্রনাথ।

"বিন্দু বিন্দু করি আহরণ, আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে?"

সৃষ্টির প্রেরণায় এগিয়ে চলেছেন কবি। সীমা হতে অসীমের পানে। জীবন থেকে জীবনোত্তরে। বিশ্ব হতে বিশ্বরূপে—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।"

পূর্ণতার পূর্ণসম্ভারে বিশ্বকবি জ্যোতির্ময়। তাঁর নিমন্ত্রণ লোকে, 'আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে' কবির অন্তর্লোকের ব্যঞ্জনা যত গভীর, বহি-র্লোকের দীপ্তি তত সুন্দর, সুমধুর, নয়নমনোহর।

পৃথিবীর আঘাত নিষ্ঠুর, পৃথিবীর অপমান বিষাক্ত, পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ প্রবঞ্চনা কর্কটরূপিনী ভয়ঙ্করী, তবু স্বর্গের অমৃতপ্রসাদে কবিচিত্ত সিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত। তখনও কবি আপন সত্তাকে বিকশিত করে গাইছেন—

"সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

একটি মাত্র পথ! সেই পথ! যে পথ ধরে চিরকাল মানুষ চলেছে স্বর্গের আলোকবিন্দুর প্রত্যাশায়। কোন মানুষ এগিয়ে যায়, কেউ বা পিছিয়ে পড়ে। কারুর পথ হারিয়ে যায় নরকের অন্তরালে, কারুর প্রত্যাবর্তন ঘটে পৃথিবীর মাটিতে।

কবির তপস্যায় বিঘ্ন নেই। তাঁর অন্তর্লোক থেকে যে দেবতার আবির্ভাব, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন কবিবরকে। কবি জ্ঞাত, পৃথিবীতে আর কেউ নেই সঠিক পথ প্রদর্শন করার। একমাত্র অন্তর্দেবতাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন সেই আলোর বিন্দুতে, যে বিন্দু স্পর্শমাত্রই মানুষ হয়ে ওঠে অমৃতস্য পুত্রাঃ। কবিবর সেই বিন্দুর দিকে এগিয়ে চলেছেন অহরহ। কখনও মনে হয় অন্তর্দেবতা কোথায় সরে গেছেন, তখনই কবিকণ্ঠে বেজে ওঠে তাঁর আবেগভরা গান:

"আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে
যাও যে সরে।"

জীবনদেবতার মন্ত্র শ্রেষ্ঠমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, জীবনের গভীরতম মন্ত্র। জীবনদেবতার মন্ত্রে বার বার সেই গানই গীত, সেই প্রেমমন্ত্র উচ্চারিত, যে মন্ত্র গভীরতম, যে মন্ত্র বিশ্বপ্রেমে আবদ্ধ, যে মন্ত্রে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দেশপ্রেমিক করে তোলে, সেই মন্ত্রেরই গান গাইলেন কবিবর :

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই!
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

এক আশ্চর্য কবির আবির্ভাব। কবি তাঁর প্রাণের আবেগে, কল্পনার আবেশে, কবিতার সৃষ্টি করে চলেছেন দিবারাত্র। কবিজায়ার কপট অভিমান :

"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে, এ কী ছেলেখেলা—
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা।
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

কবি তাঁর আশ্চর্য লেখনীতে সৃষ্টি করে চলেছেন স্বর্গীয় কাব্যকূজন। রাজসভা মাঝে কবি উপস্থিত হলেন তাঁর কাব্যসুষমা হাতে নিয়ে। রাজাকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে পৃথিবীর কবিদল এসেছেন নিজ নিজ কাব্যসম্ভার নিয়ে। তাঁদের সামনে ভীরু পায়ে কবি এসে দাঁড়ালেন সভামাঝে।

কবি করজোড়ে বিশ্বমানবের কাছে নিবেদন করলেন আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে :—

"প্রকাশ্যে জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমলমানস সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা

কবি থামলেন। বিশ্বসমাজের সমস্ত শ্রোতা বিমুগ্ধচিত্তে শুনলেন কবির কাব্যগাঁথা। একবাক্যে স্বীকার করলেন কবি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এঁরই প্রাপ্য :

সিংহাসন থেকে রাজা নেমে এসে কবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে—

"কহিলা, ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য—
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।"

কবি বিনীতভাবে রাজপুরস্কার গ্রহণ করলেন, তারপর তাঁর অমৃতলোকের বীণাখানির মৃদু তান তুলে, মৃদুকণ্ঠে, অমৃতলোকের সুরে মর্ত্যবাসীকে শুনিয়ে দিলেন :

"জগৎ জুড়ে উদাস সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়ামাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

॥ এগারো ॥

উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি

১৯১৪ সাল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র আবার ইয়োরোপ ভ্রমণে যাওয়া মনস্থ করলেন। ভ্রমণ না বলে জয়যাত্রায় বললে ঠিক শোনাবে। বীর সেনাপতি জগদীশচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর গাছপালার সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ার স্থির করলেন।

কলকাতার ইতিহাসের অনেক বদল হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ-এ সম্মানিত হয়ে বিশ্বকবি হয়েছেন আগের বছরে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। আচার্য জগদীশ-চন্দ্রকেও আজ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্রদ্ধা করে পৃথিবীর মানুষ। বাঙালী সেদিন জাতির গর্ব, দেশের গর্ব, পৃথিবীর গর্ব.

জগদীশচন্দ্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন: নাম Plant Response as a Means of Physiological Investigation.

১৯০৭ সালে প্রকাশ করলেন পরবর্তী গ্রন্থ: Comparative Electro-Physiology.

১৯১২ সালে সি. এস. আই. উপাধি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনসভায় পেলেন সম্মানসূচক ডি. এস. সি. ডিগ্রী।

১৯১৩ সালে বন্ধুবর পেলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার আর আচার্যদেব প্রকাশিত করলেন চতুর্থ গ্রন্থ: Researches on the irritability of plants.

কলকাতা থেকে গেলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান-সূচক বক্তৃতা দেবার জন্যে।

॥ প্রতিটি কথা আজ মানুষ মেনে নিয়েছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতায় যে সন্দেহ ছিল, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণে তার সব কিছুই নির্মূল হয়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র ক্রেস্‌কোগ্রাফ, রেসোন্যাণ্ট রেকর্ডার, ডেথ রেকর্ডার যন্ত্রগুলিকে পরমযত্নে সাজিয়ে নিলেন। লজ্জাবতী লতা আর বনচাঁড়ালের গাছ নিলেন যথাসাধ্য হালকা টবে। দুটি লজ্জাবতী লতা আর দুটি বনচাঁড়ালের গাছের টব জাহাজে করে নিয়ে চললেন আচার্যদেব, সহকারীরা অন্য সব গাছের চারা এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে অন্য জাহাজে সরাসরি ইয়োরোপ গিয়ে গুরুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জগদীশচন্দ্র যে জাহাজে যাচ্ছিলেন, সেই জাহাজের এক কোণে লজ্জাবতী এবং বনচাঁড়ালের টব দুটি রেখেছিলেন।

জাহাজে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে যাচ্ছিল, তারা যেন একটা খেলা পেয়ে গেল। মাঝে মাঝে আসে, লজ্জাবতীর পাতা ছুঁয়ে পালিয়ে যায়। পাতাগুলো নেতিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে আবার পাতাগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। আবার পাতা ছুঁয়ে পালিয়ে যায়। বারবার এ ধরনের আঘাতে পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে যেতে লাগল। একদিন জগদীশচন্দ্র জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন—এই গাছগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অনুভূতিপরায়ণ। এগুলো ইয়োরোপে না পৌঁছলে আন্তর্জাতিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে; ইংরেজ শক্তি আমাকে যদি কিছু প্রশ্ন করেন, আমি তোমাকে দায়ি করব।

ক্যাপ্টেন সাহেব ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—আপনি তারের বেড়া করে দিন খাঁচার মত করে। যাতে ছেলে বুড়ো কেউ যেন গাছের পাতায় হাত লাগাতে না পারে।

ক্যাপ্টেন সাহেবের তৎপরতায় সত্যি সত্যি সুন্দর তারের খাঁচা তৈরি হয়ে গেল। সেই খাঁচার মধ্যে গাছগুলিকে সযত্নে রাখলেন আচার্য জগদীশ-চন্দ্র। সকাল সন্ধ্যে জল দিতেন আর দেখতেন। ক্যাপ্টেনও তৎপরতার সঙ্গে দেখতেন যে কেউ হাত দিচ্ছে কিনা। রোজ সকালে চা পানের পর ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে বলতেন—তোমার খাঁচার পাখিগুলো কেমন আছে?

জগদীশচন্দ্র মৃদু হাসলেন। কোন উত্তর দিলেন না। বন্ধুবরের একটি গান তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল ক্ষণে ক্ষণে—

"খাচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।"

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ২০শে মে। ভীষণ ঠাণ্ডা! মানুষের হাত-পা জমে যাবার অবস্থা, সামান্য গাছগুলো বাঁচে কি করে?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার স্থান সাব্যস্ত হল। জগদীশচন্দ্রের সহকারী ছাত্র যখন গাছের টবগুলিকে অক্সফোর্ডে এনেছেন, তখন ঠাণ্ডায় সব হিম হয়ে গেছে যেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। আচার্যদেব অন্তরে ভীত হয়ে উঠলেন। কি জানি, এত ঠাণ্ডায় যদি প্রতিক্রিয়ার সাড়া না দেয় গাছগুলি! গাছগুলি তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে যদি সঠিক সাড়া না দেয়, তাহলে কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন না আর পুরো ব্যাপারটাই গল্প কথা হয়ে দাঁড়াবে।

ল্যাবোরেটারীতে একটি ঘর পেলেন বেশ গরম। কাচ ঘেরা ঘরে গাছগুলোকে রাখার অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল।

জগদীশচন্দ্র ধীরপায়ে বক্তৃতার ঘরে প্রবেশ করলেন। লম্বা ঘর। একদিকে শ্রোতার গ্যালারী, অন্যদিকে বক্তার মঞ্চ এবং টেবল। টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানি পেছন দিকে রেখে ক্ষণিকের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, সামনে শ্রোতার আসনে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কেউই সাধারণ শ্রোতা নন। প্রত্যেকেই অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন সংস্থার বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক। এ সভায় শুধু পদার্থবিদ নেই, এ সভায় আলোকিত করে রেখেছেন খ্যাতনামা শারীরবিদ্যার মহাপণ্ডিতবর্গ।

মানুষের জীবনদর্শনের গতিপথের নিয়ম বহুমুখী, তার সঙ্গে বিপরীতমুখীও বটে। আমরা শীতের অনুভূতিতে কুঞ্চিত হয়ে পড়ি, গরমের স্পর্শে স্ফীত হই। আমরা রেগে উঠি, শোকের অনুভূতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ি, আনন্দে হাসি। আমাদের মতই বৃক্ষজীবনেও অনুভূতি আছে। আমাদের মতই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণের অনুভূতি বৃক্ষের অব্যক্ত জীবনেও আছে।

বৃক্ষের কথা আমার বলে লাভ কি? বৃক্ষ যদি তার নিজের কথা নিজের ভাষায় বলে, সেই কথাগুলি আমাদের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

জগদীশচন্দ্র একবার দর্শকদের দিকে তাকালেন। নিস্তব্ধ নিথর। হলের মধ্যে একটা আলপিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে বোধ হয়।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সহকারীর দিকে তাকালেন! টেবলের ওপর সাজানো যন্ত্র রেসোন্যান্ট রেকর্ডার।

—লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যান, আচার্য জগদীশচন্দ্র দর্শকের দিকে তাকালেন। তাঁরা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাঁরা বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনছেন না, তাঁরা যেন জীবনের অবিশ্বাস্য অবিস্মরণীয় জাদু দেখতে এসেছেন।

—এই যে যন্ত্র, এর নাম রেসোন্যান্ট রেকর্ডার। এই যন্ত্রের সঙ্গে লজ্জাবতী লতার স্পর্শ করিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাবেন গাছের অনুভূতির প্রতিটি ছবি কাগজের গায়ে আপনা থেকেই আঁকা হয়ে যাবে। গাছের অনুভূতি, গাছের

ভাষায়, গাছের কাগজে আপনা থেকেই লেখা হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে আপনারাও দেখে যাবেন শুধু। কারুর কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবেন, উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।

শ্রোতাদের মুখে একটি কথাও নেই। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের দিকে।

জগদীশচন্দ্র ধীরভাবে অন্য যন্ত্রটির কাছে গেলেন। বনচাঁড়ালের গাছের সঙ্গে যন্ত্রের সীমাপ্রান্ত যোগ করে দিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যন্ত্রটির নাম অসিলেটিং রেকর্ডার। এই গাছের নাম দেজমোডিয়াম গীরান্‌স্ (Desmodium Gyrans)। আমাদের যেমনি হৃদপিণ্ড চলে, গাছেরও ঠিক তেমনি হৃদপিণ্ড চলে, আর এই দেখুন তার প্রমাণ।

যন্ত্রটি চালিয়ে দিলেন জগদীশচন্দ্র। উপস্থিত সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন মানুষের হৃদপিণ্ড চললে কাগজের ওপর যে ধরনের ছবি আঁকা হয়ে যায়, ঠিক সেই একই রকম দাগের ছবি উঠে যাচ্ছে অসিলেটিং রেকর্ডারের গ্রাফ পেপারের ওপর।

জগদীশচন্দ্র আবার নতুন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। একটি বৃক্ষের ওপর সামান্য পটাশিয়াম সায়ানাইড বিষ দিয়ে বললেন, আমি গাছের ওপর যে বিষ ছড়িয়ে দিলাম, তার নাম পটাশিয়াম সায়ানাইড এবং এ বিষ সর্বজনবিদিত। এই বিষ প্রাণীদেহে প্রয়োগ করলে যে যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, গাছের দেহেও প্রয়োগ করলে সেই রকম একই ধরনের যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। এই দেখুন—

যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণাক্লিষ্ট গাছের সংযোগ করে দিলেন। অপর যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে দিলেন একটি ব্যাঙের দেহের, তার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বিষের গুঁড়ো।

যন্ত্র চলছে—

সিনেমা দেখার মত শ্রোতার দল দেখে যাচ্ছেন। বিষের প্রতিক্রিয়ায় দেহের মধ্যে যে যন্ত্রণার উদ্রেক তার ছবি হুবহু ফুটে উঠছে কাগজের গায়ে। গাছের যন্ত্রণা আর প্রাণীর যন্ত্রণার অনুভূতি একেবারে এক। কোনটি প্রাণীদেহের ছাপ আর কোনটি গাছের ছাপ বলা অসম্ভব।

—লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যান—

জগদীশচন্দ্র তাঁর উদাত্ত মন্দ্রস্বরে বললেন—এইবার বিষের প্রতিষেধক ওষুধ দেব। দেখা যাক, তার কি প্রতিক্রিয়া হয়!

প্রতিষেধক ওষুধ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিষের প্রতিক্রিয়া কেটে যেতে লাগল। গাছ এবং প্রাণীজগৎ আবার ফিরে আসছে আলো, বাতাস আর জলভরা পৃথিবীতে।

দাগ পড়ছে।

বেঁচে ওঠার দাগ।

মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে আসার স্পন্দন রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠছে যন্ত্রের গায়ে। আবার নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে উদ্ভিদের অব্যক্ত আর প্রাণীর ব্যক্ত অভিব্যক্তি একই সঙ্গে। দু'জনের রূপই এক, অভিন্ন। সে দাগের ছবি যন্ত্রে আপনা থেকেই উঠেছে। গাছের অভিব্যক্তি গাছের মধ্যে থেকেই প্রকাশিত। আপনা থেকেই সব দাগ দর্শকদের সামনে ফুটে উঠছে জাদুবিদ্যার মত।

বিজ্ঞানীরা স্তব্ধ। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য। বিজ্ঞানীরা সম্মোহিত। তাঁরা বার বার চেষ্টা করলেন কোন ভুল ধরার, কোন ত্রুটি আবিষ্কার করার, কিন্তু অসম্ভব। সামান্যতম ভুলও আবিষ্কার করতে পারলেন না জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায়, পরীক্ষায়, নিরীক্ষায়।

যেসব বৈজ্ঞানিকের দল সবচেয়ে উন্নাসিক, সবচেয়ে সন্দিগ্ধ তারাও অকুণ্ঠ-স্বরে বললেন—সব প্রাণই এক। সকলেই একই রকমের যন্ত্রণা বোধ করে।

অক্সফোর্ড থেকে রয়াল ইনস্টিটিউশন! বৈজ্ঞানিকদের পীঠস্থান। এখানে বক্তৃতা দেবার অর্থ হল বৈজ্ঞানিক সম্মানের রাজতিলক ধারণ করা। একদিন এখানে এই মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে টমাস ইয়ং, হামফ্রে ডেভি, মাইকেল ফারাডে, জন টিনডল, লর্ড র‍্যালে, স্যার টমসন—আরও কত যুগান্তকারী বিজ্ঞানী বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই মঞ্চে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত।

রয়াল ইনস্টিটিউশনের নিয়ম প্রতি শুক্রবার রাত ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত কোন এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেবেন। এই বক্তৃতায় কোন সভাপতি থাকেন না। বক্তা তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, শ্রোতারা একমনে শোনেন, প্রয়োজন-বোধে প্রশ্ন করেন, তারপর বিদায়গ্রহণ করেন। এই বক্তৃতা-কাল নির্দিষ্টভাবে এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টা রয়াল ইনস্টিটিউটের সামনে এত গাড়ি জমা হয়, যে লোক চলাচল ট্রাফিক যাতায়াত একদম বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিস থেকে। একঘণ্টার বেশি বক্তৃতা হয় না। তারপর যথাযথ আবার যানবাহন চলাচল শুরু করে।

সেদিন শুক্রবার!

জগদীশচন্দ্র আহূত হলেন বক্তৃতামঞ্চে।

রাত ঠিক ন'টা!

জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা শুরু করলেন, তার সঙ্গে অজস্র ধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ঢং ঢং—

রাত দশটার ঘণ্টা পড়ল। জগদীশচন্দ্র নিয়মমত থামিয়ে দিলেন তাঁর বক্তৃতা। শ্রোতারা থামলেন না। তাঁরা একযোগে বলে উঠলেন—আপনি বক্তৃতা দিয়ে যান, শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবেন না।

—কিন্তু রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। গাড়ি ঘোড়া যেতে পারছে না। লোকও যাতায়াত করতে পারছে না।

—তা হোক!

জগদীশচন্দ্র আবার শুরু করলেন তাঁর আবিষ্কৃত অমৃত-বক্তৃতা। বক্তৃতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা যতক্ষণ না শেষ হল, ততক্ষণ প্রত্যেকটি শ্রোতা পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

এক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন জগদীশচন্দ্র, তারপর শুরু করলেন তাঁর যুগান্তকারী বক্তৃতামালা।

জগদীশচন্দ্রকে সেই সভার বৈজ্ঞানিকেরা আখ্যা দিলেন 'উইজার্ড অফ দি ঈস্ট'।

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামতি লর্ড র‍্যালে জগদীশচন্দ্রকে প্রশংসা করে বললেন—তোমার বক্তৃতামালা একেবারে অবিশ্বাস্য। বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যেও দু-একটা এক্সপেরিমেণ্ট ভুল করতে পারতে—

সকলে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

রয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার রথ জয়ধ্বজা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুন আকাশ মেঘচ্ছন্ন। প্রচণ্ড হিমেল বাতাস বইছে। জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর ভাইনস্।

আবার বক্তৃতা।

স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন থেকে শুরু করে অগণিত জ্ঞানীপুরুষের দল ভিড় করে বসে আছেন সভাকক্ষে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহাপণ্ডিত। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ভুল হয়, মুহূর্তের মধ্যে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা, বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়ে যাবে। প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতে হবে বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষর। মহাজ্ঞানীদের কাছে খুলে ধরতে হবে আপন জ্ঞানের সঞ্চয়।

প্রচণ্ড শীতে প্রথমটা গাছগুলো কুঁকড়ে গিয়েছিল, একটু উত্তেজক ওষুধে ওগুলো আবার সজীব হয়ে উঠল এবং জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ তীর ক্ষেপণের মত দ্রুত শরত্যাগ করতে লাগলেন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতই আচার্য জগদীশচন্দ্র নিপুণভাবে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন।

স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন তার বক্তৃতায় প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিলেন। সবশেষে বললেন—"The results of Prof. Bose's researches not merely affect Physiological Botany but are also of the deepest import in various other branches of Science and much might be expected from the furtherance of his work."

ইয়োরোপের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের জয়গান। সবদিক থেকেই নিমন্ত্রণ। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই অভ্যর্থনা জানায় ভারতীয় বিজ্ঞানীকে। সকলেই বলেন—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দিয়ে যান। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা এ সম্পর্কে নতুন কিছু শিখুক।

প্যারিস, মিউনিক, বন, ভিয়েনা—সকলেই ডাকছেন, কিন্তু আগে কোথায় যান এ সম্পর্কে প্রথমে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, তারপর ঠিক করলেন আগে ভিয়েনা যাবেন, তারপর সেখান থেকে প্যারিস বন্ হয়ে ফিরবেন।

ভিয়েনায় বিশ্ববিদ্যালয় নয়নমনোহর রাজপ্রাসাদ। অধ্যাপক মলিশ্ উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ. তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আচায জগদীশচন্দ্রকে। সঙ্গে করে ঘুরিযে ঘুরিয়ে সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট দেখালেন। তিনিও উদ্ভিদ-বিদ্যায় যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাও জগদীশচন্দ্রকে দেখালেন। একটি টম্যাটো গাছের সঙ্গে আলুর গাছ এমন সুন্দরভাবে গ্রেপ্ত করেছেন অধ্যাপক মলিশ, যে একই গাছ, একসঙ্গে আলু এবং টম্যাটো হচ্ছে।

বক্তৃতার আয়োজন হল। অপূর্ব সভাকক্ষ, অপূবতর শ্রোতৃবৃন্দ। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনলেন। রেসোন্যাণ্ট রেকর্ডার, অসিলেটিং রেকর্ডার, ডেথ রেকর্ডার, ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রগুলি দেখে শুধু মুগ্ধ নয় আশ্চর্য বিস্ময়ে মন্তব্য করলেন সকলে তোমাদের ইনস্ট্রুমেণ্ট তৈরি করার কারখানা নিশ্চয়ই খুব বড় আর ভাল।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হাসলেন। কোন জবাব দিলেন না। ফ্যাক্টরি! কি কষ্ট করে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে দিনের পর দিন অসাধারণ পরিশ্রম করে যন্ত্রগুলি তৈরি করেছেন। আর বৃটিশ সরকার। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে।

অধ্যাপক মলিশ্ দেখলেন জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রগুলি এক কোটি গুণ ম্যাগ-নিফাই করে এবং তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন—এসব যন্ত্র তৈরি ব্যাপারে তোমার কাছে আমরা শিশু।

মলিশের কয়েকজন ছাত্র ভিড় করে কাছে দাঁড়িয়েছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁদের দিকে তাকাতে মলিশ্ কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—ওদের দু-একটা প্রশ্ন আছে। যদি উত্তর দিয়ে দাও—ওদের উপকার হয়।

—কি প্রশ্ন?

একটি ছেলে এগিয়ে এল। সে তার প্রশ্নগুলি পেশ করল, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানাল গত তিন বছর এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারছে না বলে ডক্টরেট করতে পারছে না—

জগদীশচন্দ্র তার সহকারীকে বললেন—আমার লেখা 'Researches on the irritability of Plants' বইখানা বার করে দাও।

সহকারী আদেশ পালন করলেন। জগদীশচন্দ্র বইখানি মলিশের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এই বইয়ের একশো ছিয়ানব্বই নম্বর পাতায় সমাধান বলা আছে।

মলিশ্ পড়ে বইটি ছাত্রর হাতে দিলেন। ছাত্রটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন —আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ?

—গীভ্ ইট টু মী—

ছেলেটির হাত থেকে বইখানি নিয়ে তরতরিয়ে পাতা উল্টে একটা জায়গায় থেমে বললেন—এই পাতায় লেখা আছে, তার সঙ্গে ডায়াগ্রামও আছে।

পাতাগুলো দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয় ছাত্রটি। তিন বছর ধরে সে যে সমস্যার সমাধান করতে পারছিল না, কয়েক মুহূর্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

—অ্যাণ্ড দি আনস্যার ফর মাই কোশ্চেন ? তৃতীয় ছাত্র প্রশ্ন করল।

জগদীশচন্দ্র এবার আর বই হাতে নিলেন না, শুধু বললেন—প্লীজ গো থ্রু চ্যাপটারস্ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি গি অ্যাণ্ড ইউ উইল গেট এভরিথিং।

মলিশ্ ছাত্রদের বিদায় দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে বললেন—তোমার দেশে, তোমার ল্যাবোরেটারীতে যদি আমি কোন ছাত্র পাঠাই শিক্ষাগ্রহণের জন্যে, তোমার আপত্তি হবে না তো ?

জগদীশচন্দ্র হাসলেন। তাঁর ল্যাবোরেটারী। আসছে বছর তাঁর চাকরির অবসর গ্রহণের বছর। তারপর কোথায় তিনি রিসার্চ করবেন, কীভাবে রিসার্চ করবেন, কিছুই ঠিক নেই।

যদি নিজের একটা ল্যাবোরেটারী থাকত।

গভর্ণমেণ্ট কি সাহায্য করবে ? অত টাকা তিনি কোত্থেকে পাবেন ? নইলে নিজের একটা ল্যাবোরেটারী তৈরি করতেন—নাম দিতেন : বসু বিজ্ঞান মন্দির।

—হোয়াট হ্যাপেন ? ইউ আর সাইলেণ্ট ? ইউ ডোণ্ট ওয়ান্ট স্টুডেণ্টস ?

জগদীশচন্দ্র হেসে জবাব দিলেন—এখনও জবাব দেবার সময় আসে নি প্রফেসর মলিশ। যেদিন সময় আসবে আমি নিজে আপনাকে উত্তর দেব।

প্যারিস্, স্ট্রাসবুর্গ, লিপজিগ, হেল, বার্লিন, বন্ পরপর প্রোগ্রাম তৈরি।

প্রথমে প্যারিসে এলেন। প্যারিস জগদীশচন্দ্রের কাছে নতুন নয়। এর আগেও তিনি প্যারিসে এসেছিলেন। সেদিন এসেছিলেন পদার্থবিদ্যার বক্তৃতা দিতে। সেদিনের বক্তৃতা শুনে সায়ান্স অ্যাকাডেমীর সভাপতি কর্নু লিখেছিলেন—

"You should try to revive the grand traditions of your race, which bore aloft the torchlight of science and art and was the leader of civilisation two thousands years ago, we, in France, applaud you."

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামণ্ডপ। লোকে লোকারণ্য। জগদীশচন্দ্র

এমনিতেই প্যারিসে খ্যাতিমান, তার ওপর এই অত্যাশ্চর্য পরীক্ষাগুলোর কথা সমস্ত দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রশংসার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। জগদীশ-চন্দ্রকে চোখে না দেখলেও, তাঁর নাম জানেন না এমন লোক ইউরোপে পাওয়া মুশকিল। প্যারি শহরের অধিকাংশ মানুষ সেদিন তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন।

জগদীশচন্দ্র তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমে গাছের অনুভূতি স্পন্দন দেখালেন ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে। প্রত্যেকটি মানুষ দেখল ঠিক মানুষের মতই গাছের অনুভূতি স্পন্দন রয়েছে।

—লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান জগদীশচন্দ্র তার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন এবার পটাশিয়াম সায়ানাইড বিষ প্রয়োগে গাছের কী নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, তার পরীক্ষা দেখাব।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন কিছু পটাশিয়াম সায়ানাইড গাছের ওপর ছিটিয়ে দেবার।

সহকারী আদেশ পালন করল।

প্রত্যেকটি মানুষ রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা!

এক মিনিট—দু' মিনিট—তিন মিনিট---

জগদীশচন্দ্রের ভুরু কুঞ্চিত। কই? বিষের তো কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। গাছের পাতাগুলি আগের মতই নেচে বেড়াচ্ছে।

—আর একটু দাও—আচার্যদেবের কণ্ঠস্বর গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল।

একটু ইতস্ততঃ করে সহকারী আরও খানিকটা সাদা গুঁড়ো গাছের ওপর ছিটিয়ে দিল।

সহকারী ভয়ে কাঠের মত নিস্পন্দ নিথর। শ্রোতারা হতবাক্। জগদীশ-চন্দ্র চিন্তিত, এবং আশ্চর্যান্বিত। জীবনে এ ধরনের ব্যর্থতা তো কোনদিন হয় নি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে জগদীশচন্দ্র সহকারীর সামনে দাঁড়ালেন। সহ-কারীর হাত থেকে বিষের মোড়কটি নিজের হাতে নিলেন। সকলকে আতঙ্কিত, বিহ্বল, শিহরিত করে জগদীশচন্দ্র মোড়ক থেকে এক টিপ বিষ তুলে নিয়ে নিজের মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন।

সভাস্থ সকলে সভয়-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন। সকলেই ভাবছেন এক্ষুণি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিষের জ্বালায় মঞ্চের ওপর লুটিয়ে পড়বেন।

জগদীশচন্দ্র স্থির অচঞ্চল। কোন বিকৃতি নেই, কোন যন্ত্রণা নেই, কোন পরিবর্তন নেই। বন্ধুগণ! আমি হলফ করে বলতে পারি, মোড়কে যে ওষুধ আছে তা পটাশিয়াম সায়ানাইড নয়, দিস ইজ এ প্যাকেট অফ সুগার—

—নো স্যার! বাইশ বছরের মেরিয়ান দাঁড়িয়ে উঠে বলল—আমি নিজে ওষুধের দোকান থেকে কিনে এনেছি। এই দেখুন ক্যাশমেমো।

জগদীশচন্দ্র ক্যাশমেমো দেখলেন। প্যারিস শহরের এক বিখ্যাত ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমো। তাঁরা মিথ্যে কথা লেখার লোক নন। ভেজাল ওষুধ দেবার মানুষ নন।

মেরিয়ানও অত্যন্ত সম্মানিত বাড়ির মেয়ে। তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই নেই। যে বাড়িতে জগদীশচন্দ্র প্যারিসে ছিলেন, সেই বাড়ির গৃহস্বামীর মেয়ে মেরিয়ান। মেরিয়ান অত্যন্ত ধীর স্থির চরিত্রবতী। তার কথা অবহেলা করার কোন অর্থই হয় না। দেন? সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াট ইজ দি ম্যাটার?

জগদীশচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—আমি বলছি আমার হাতে যে মোড়কটি আছে, তাতে কখনও পটাশিয়াম সায়ানাইড নেই। মিস্ মেরিয়ানের কথাও অবিশ্বাস করতে পারি না। এর মাঝখানে কোথাও কিছু গোলমাল আছে—

—গোলমাল আর কি? আপনার পরীক্ষাটাই গোলমেলে—

দর্শকের আসন থেকে দু' একজন মন্তব্য ছুড়ে দিল। জগদীশচন্দ্র সভার চারদিকে তাকালেন। এ ধরনের অপমানজনক উক্তি জীবনে শোনেন নি। অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে অবশেষে সভাপতির দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। হাতের মোড়কটি নিয়ে উঁচু করে দেখিয়ে বললেন—মাননীয় সভাপতি! এই মোড়কে যদি পটাশিয়াম সায়ানাইড থাকে, তাহলে সমস্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলে এখানকার অর্ধেক লোক মারা যাবেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু দেখুন,—মোড়কের সমস্ত পদার্থ আমি খাচ্ছি।

সমস্ত পদার্থ মুখে পুরে দিয়ে কাগজের মোড়কটা মুড়ে ফেলে এক গ্লাস জল খেয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন—আমি বলছি এই মোড়কে যা ছিল, তা সুগার অফ মিল্ক।

—ইয়েস স্যার! ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি রাইট।

টাক মাথায় গ্যালিস স্যুট পরা এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ধীর পায়ে মঞ্চের ওপর উঠে সবিনয়ে বললেন—আমার নাম ডক্টর ফিলিপস। যে দোকান থেকে মিস্ মেরিয়ান পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনতে গিয়েছিল আমি সে দোকানের মালিক, তাছাড়া আমি মেরিয়ানদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

প্যারী শহরে ডাক্তারের প্রেসকৃপশন ছাড়া পটাশিয়াম সায়ানাইড জাতীয় কোন বিষই বিক্রী করা হয় না। মেরিয়ান যখন গিয়ে আমার দোকানের কাউণ্টারে পটাশিয়াম সায়ানাইড চায়, তখন কাউণ্টার লেডি ভয় পেয়ে, ভেতরে গিয়ে আমাকে বলেন।

আমি ভাবলাম মেরিয়ান বোধহয় কোন ভালবাসার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। ও যা অভিমানী আর ভাল মেয়ে। সেই অসম্মান সহ্য করতে না পেরে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবে। অথচ আমি যদি বলি

বিষ দেব না, ও তাহলে যে কোন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। ওকে সকলেই সম্মান করে আর অনায়াসেই ও আসল বিষ পেয়ে যাবে। সেইজন্যে আমি কাউণ্টার লেডিকে কিছু না বলে পটাশিয়াম সায়ানাইডের দাম দিয়ে ক্যাশমেমো দিতে বললাম। বিষের আলমারির চাবি আমার কাছে থাকে ; অথএব অন্য কারুর বিষ দেবার উপায় নেই।

আমার কাউণ্টার লেডিকে ঘর থেকে বার করে আমি পটাশিয়াম সায়ানাইডের প্যাকেটে সুগার অফ মিল্ক ভরতি করে কাউণ্টার লেডিকে দিয়ে দিলাম। কাউণ্টার লেডি এবং মেরিয়ান দু'জনেই জানে ওরা এক প্যাকেট পটাশিয়াম সায়ানাইড এনেছে।

—প্লীজ এক্সকিউজ মী স্যারস ফর কমেডি অফ এরারস্—ডাক্তার বিনীতভাবে বললেন।

সমস্ত সভাস্থল হাসিতে ফেটে পড়ল। সেদিনের ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর ভেতরে শেষ হল।

জার্মানী যাওয়া হল না।

৪ঠা অগাস্ট ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করবেন কিন্তু ভারতসচিব লর্ড ক্রু জগদীশচন্দ্রকে তারবার্তায় জানালেন ঃ ইমিডিয়েটলি লণ্ডনে চলে যাও ঃ তোমার আবিষ্কারের পরীক্ষা লণ্ডনের জ্ঞানীরা দেখার জন্যে উন্মুখ। তুমি এক মুহূর্তও দেরি করবে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র তারবার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে গেলেন বন্ ইউনিভারসিটির পর্যটন বাতিল করে। ২রা অগাস্ট জগদীশচন্দ্র বন শহরে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন কিন্তু ভারতসচিবের নির্দেশ পেয়ে জার্মানী সফর বাতিল করে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন আর ৪ঠা অগাস্ট ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল, ইংলণ্ড জার্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে ফিরে এলেন। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ তখন লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভাপতি। তাঁর বয়স আশীর ওপরে। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি পূজিত সম্মানিত। স্যার ক্রুকস-এর আবিষ্কার ক্রুক্স্ টিউব থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এক্স-রে আর ইলেকট্রন।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার গাছ এবং যন্ত্রপাতি রাখার জন্যে সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন ময়দাভেলএ। জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক এই বাড়ির পেছন দিকে থাকেন আর সামনের ঘরগুলিতে সাজিয়ে রেখেছেন নিজস্ব আবিষ্কৃত যন্ত্র আর গাছের টবগুলি।

তিরাশী বছরের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্, তেইশ বছরের যুবকের আনন্দ নিয়ে ময়দাভেলের পরীক্ষাগারে এলেন জগদীশচন্দ্র আবিষ্কৃত

'প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফারস্' যন্ত্র দেখার জন্যে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুবকের উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর জগদীশচন্দ্র পরম উৎসাহে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্র সাব্যস্ত করেছিলেন 'কণ্ট্রোল অফ নার্ভাস্ ইম্পাল্স্' নামের যে নতুন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন, সেটি ক্রুক্স্ এবং বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ স্যার রোজ ব্রাডফোর্ডকে দেখাবেন, বোঝাবেন, তাঁর মতে নিয়ে আসবেন।

ফিজিওলজি, ফিজিওলজি !

শারীরতত্ত্ববিদেরা যদি জগদীশচন্দ্রের ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেন, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থবিদ এবং শারীরতত্ত্ববিদ একই সঙ্গে স্বীকার করবেন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের তাৎপর্য।

সমস্ত পরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখলেন স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্। তিনি বিমোহিত হলেন প্রাচ্যের বৈজ্ঞানিকের আশ্চর্য আবিষ্কারে। তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন জগদীশচন্দ্রের কাছে একখানি চিঠির মাধ্যমে ঃ

"I was much impressed by the most ingenius and novel self-recording instruments, whereby you are able to make plants automatically record their response to electric and other stimulations and their own movements when no outside stimulous affects them. The means of physiological investigation afforded is of much importance. I will give a review of your researches in the Chemical News so that others may be able to read and understand the novel facts you have discovered."

জগদীশচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতার আয়োজন করলেন। বক্তৃতার বিষয় ঃ কনট্রোল অফ নার্ভাস্ ইম্পাল্স্।

এই বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে বৃক্ষের এই স্পন্দন, এ শুধু পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নয়, এর মধ্যে নিহিত আছে শারীরতত্ত্ব। মানুষের স্নায়ুশিরায়, প্রাণীর স্নায়ুশিরায় যে ভাবে স্পন্দন যাতায়াত করে, ঠিক তেমনি ভাবেই উদ্ভিদের ভেতরেও স্পন্দন যাতায়াত করে।

জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করলেন। পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। জর্জ বার্নাড শ দেখতে এলেন জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ইংরেজী সাহিত্য ও নাট্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জর্জ বার্নাড শ নিরামিষভোজী ছিলেন। সেজন্য তিনি বেশ খুশী ছিলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা দেখে দু' চোখের তারা বড় হয়ে গেল।

স্থির হয়ে গেল। বাঁধাকপিকে সামান্য আঘাত করলে সে মানুষের মতই থরথর করে কাঁপে। গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়লে তারও মানুষের মতই যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়; কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আমার এতদিন গর্ব ছিল আমি কোন প্রাণীকে বধ না করেই আমার খাবার খাই। ভারতের প্রফেসার জগদীশ বোসের এক্সপেরিমেন্টস্ দেখে আমার সে গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল।

জর্জ বার্নাড শ একদিন একা জগদীশচন্দ্রের ময়দাভেলের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত পরীক্ষাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তিনি যতবার দেখেন, ততবারই আশ্চর্য হয়ে যান। কোন কথা না বলে বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন জগদীশচন্দ্রকে :

"I have read your Discourse at the Royal Institution twice with extraordinary interest and I think I can realise the immense amount of skilful and patient work that lies behind such a short and clear statement. It certainly makes the world seem even more wonderful than it did before."

Metaphysics of Nature পুস্তকের অধ্যাপক লেখক অধ্যাপক কার্ভেথ রীড তাঁর পুস্তকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উচ্চ প্রশংসা করলেন।

নেশন পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে আচার্য জগদীশের আবিষ্কার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হল, তার সঙ্গে প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস।

বাঙালীর ছেলে, ভারতের সন্তান একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে জয় করে ফেললেন বিজ্ঞান সমরে।

॥ বারো ॥

যশের পতাকা অভ্রভেদী

বসু বিজ্ঞান মন্দির।

পৃথিবীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য জ্ঞানের তীর্থস্থান। একদিন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন মশেলের অনুরোধ শুনেছিলেন তখন নির্বাক্ হয়ে ছিলেন। কোন উত্তর দিতে পারেন নি, উত্তর দেবার মত কোন উত্তর তাঁর জানা ছিল না।

মশেল সেদিন অনুরোধ করেছিলেন—আমার কিছু ছাত্র আপনার ল্যাবোরেটারীতে পাঠাব, যদি আপনি একটু শিক্ষা দিয়ে দেন। প্রাচ্যের আশ্চর্য আশ্চর্য রিসার্চের যৎসামান্য এরা শিখতে পারবে।

সেদিন চুপ করে ছিলেন, কিন্তু সেদিন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সুযোগ পেলেই একটি রিসার্চ-কেন্দ্র গড়ে তুলবেন, যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করতে পারে।

জগদীশচন্দ্র যুদ্ধের জন্য জার্মানী যেতে পারেন নি, ফিরে আসতে হয়েছিল লণ্ডনের ময়দাভেল বাড়িতে। সেই বাড়িতেই তিনি রিসার্চ ল্যাবোরেটারী স্থাপন করলেন। দেশ বিদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেখে যেতে লাগলেন। কেউ বিস্ময়ে স্তব্ধ, কেউ বা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সকলেই নিজস্ব মতামত পাঠিয়ে দিলেন। সকলেই বললেন ইনি বিজ্ঞানী নন, ইনি উইজার্ড অফ দি ঈস্ট্। ম্যাজিসিয়ান—আমাদের চোখের সামনে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছেন।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!

ইংলণ্ড আর জার্মানীর যুদ্ধ ক্রমশ ঘনিয়ে উঠল ক্রুদ্ধ ময়াল সাপের ভয়ংকর প্যাঁচের মত।

জগদীশচন্দ্র আমেরিকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

নভেম্বর মাসের শেষে নিউ ইয়র্কে এসে নামলেন। নিউ ইয়র্কে নামার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত আবিষ্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হয়ে গেল; আমেরিকার জনসাধারণ জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা বিষয়ে অবহিত হয়ে গেলেন।

কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি। আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর লোয়ার ছিলেন রকফেলার ইনস্টিটিউটের সভ্য। তিনি অভ্যর্থনা জানালেন আচার্য জগদীশচন্দ্রকে।

একান্তে ডেকে নিয়ে প্রফেসর লোয়ার জগদীশচন্দ্রকে বললেন—একটা গোপন কথা আছে।

—বলুন—

—এখানের অধিকাংশ অধ্যাপক জার্মানী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অতএব আপনাকে ভয়ংকর রকমের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। সে বিষয়ে আপনি কিন্তু তৈরি থাকবেন।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হাসলেন। পরীক্ষা! পরীক্ষা দিয়েই তো জীবনের শুরু। শারীরবিদ্যার প্রতিটি কাজই হল পরীক্ষা। মানুষের শরীর জন্মমুহূর্ত থেকে প্রকৃতির কাছে পরীক্ষা দিয়ে চলেছে, সেই পরীক্ষায় যেদিন অকৃতকার্যতা আসে, সেদিন অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মৃত্যু দেখা দেয়।

জগদীশচন্দ্র হাসলেন।

সান্ত্বনার সঙ্গে বললেন—কোন ভয় নেই প্রফেসর। আমরা তো বৃটিশ জার্মানের যুদ্ধ করছি না। তর্কযুদ্ধে হয় আমি জিতব, নয়তো ওঁরা জিতবেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার হলঘর। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরম্ভ করলেন যুগান্তকারী বক্তৃতা উদ্ভিদের জীবন। তারপর বক্তৃতা উদ্ভিদের সাড়া।

বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ, বিস্মিত, স্তব্ধ।

বক্তৃতার শেষে কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়, তর্কযুদ্ধ নয়, বিচার নয়—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—সকলের মুখেই প্রশংসা।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন। তিনি আবেগময় কণ্ঠে বললেন—এতদিন তারা স্নাতকোত্তর ছাত্রদের পাঠাতেন জার্মানীতে আরও অধিক জ্ঞান আহরণের জন্যে। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, যদি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র কোন আপত্তি না করেন, তাহলে এখন থেকে তার ছাত্রদের পাঠাব, অধিকতর এবং নূতনতর জ্ঞানলাভের প্রত্যাশায়। আশা করি অধ্যাপক বসু এ বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর অভিমত দেবেন।

ভারতবর্ষের কাছে যাবে ইংলণ্ড আমেরিকার ছাত্রছাত্রী নতুন নতুন জ্ঞানের আশায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কি ভারতের কষ্ট সহ্য করতে পারবে? কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির এক বছরের খরচ মাত্র সাত কোটি টাকা। ভারতবর্ষ! দীন দরিদ্র মলিন বেশধারিণী এক বিধবা—

জগদীশচন্দ্রের মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। একদিন ভারতবর্ষের বুকেই ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন জ্ঞানের অন্বেষণে। জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে যেতেন জ্ঞানের আলোক তাদের নিজ নিজ দেশে।

—দেশে ফিরে আপনাকে আমি খবর দেব নিশ্চয়ই—

জগদীশচন্দ্র উত্তর দিলেন। সভাপতি খুশি হলেন।

কলম্বিয়া থেকে পেনিসিলভ্যানিয়া—পেনসিলভ্যানিয়া থেকে বোস্টন—যেখানে বাঙালী বৈজ্ঞানিক পদার্পণ করেছেন, সেইখানেই তাঁর জয়। সেখানেই তাঁর বক্তৃতার জাদুমন্ত্র মানুষকে বিস্মিত বিহ্বল করে দেয়। বোস্টনের 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব'এ বক্তৃতা দিলেন 'ম্যাটার অ্যাণ্ড থট' এই বিষয়ে। সমবেত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনলেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা, অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, অদৃষ্টপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কাউন্ট রামফোর্ড, বিজ্ঞানী মর্স, বৈজ্ঞানিক আগাসিজ, মার্গারেট ডিল্যাণ্ড, জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ—কে আগে ধন্যবাদ দেবেন—কে আগে কথা বলবেন—তারই জন্যে রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। জগদীশচন্দ্র যেন সর্বকালের নায়ক।

বোস্টন থেকে ওয়াশিংটন।

ওয়াশিংটনের আয়োজিত বক্তৃতা সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করলেন। লোকে লোকারণ্য। টেলিফোন আবিষ্কারক গ্রাহাম বেল্ এসেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে। বক্তৃতা শুরু হবার পনেরো মিনিট আগে হলে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু অসম্ভব। বসার জন্য একটি চেয়ারও খালি নেই। মাঝখানের করিডোরও ভরতি হয়ে গেছে।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রাহাম বেল্ করিডোরের একপ্রান্তে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আর এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনলেন। শুনে মুগ্ধ হলেন জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সব কথা ঠিকভাবে শুনতে না পাওয়ার জন্যে তিনি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। জগদীশচন্দ্র সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। গ্রাহাম তাঁর বাড়িতে ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদদের নিমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা সকলেই একসঙ্গে এসে বসলেন গ্রাহামের বাড়িতে। মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন তাঁর বক্তৃতা। গ্রাহাম একটি প্রেস কনফারেন্সেরও আয়োজন করেছিলেন, পত্রিকার সাংবাদিকরা জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য শুনলেন এবং পরদিনই নিউইয়র্ক টাইমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়ে গেল যুগান্তকারী আবিষ্কারবার্তা।

ওয়াশিংটন থেকে শিকাগো, উনকনসিন ইউনিভারসিটি—মিশিগান ইলিনয়—আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যশের পতাকা উড্ডীন করে জগদীশচন্দ্র এলেন জাপানে। জগদীশচন্দ্র আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরা জাপানের পথে মনস্থ করলেন কারণ প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান নিরপেক্ষ ছিল এবং এই জলপথ নিরাপদ ছিল।

জাপানে যাবার পথে জগদীশচন্দ্র অত্যধিক মানসিক এবং কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। জাহাজে ডাক্তার পরীক্ষা করলেন, ওষুধ দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়লো। জাপানে নেমেও তাঁর শরীরের পরিবর্তন ঘটল না।

জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষা করলেন টোকিও ইণ্টারন্যাশনাল হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাক্তার টেনস্লার। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে বললেন— অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম আর স্নায়বিক ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিলেন চিকিৎসক। বিশ্রামের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কামাকুরার স্বাস্থ্য-নিবাসে। সমুদ্রের বুকে স্বাস্থ্যনিবাস।

তিন সপ্তাহের বিশ্রামে আবার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। মনে জোর এলো। দেহে শক্তি হল। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন।

তাঁর থামলে তো চলবে না। ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে আবার তিনি এক আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলবেন, বিজ্ঞানীদের মন্দির, নবযুগের নতুন নালন্দা।

কল্পনা করা এক জিনিস আর তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা এক জিনিস। প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি করার সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নীচতা তিনি বার বার দেখেছেন।

মনে আছে ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৩ সালের ১৮ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন ঃ

"The college routine was made as arduous as possible for him so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence and flagrant misrepresentation."

বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সহানুভূতি আর সাহায্যের কথা জীবনব্যাপী মনে রাখবেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ একদিন জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দু' বন্ধুতে নানা রকম গল্প করতে লাগলেন। অবলাদেবী উভয়ের জলযোগের ব্যবস্থা করবার উদ্যোগ করতে রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন—দুজন নয়, তিনজনের—

তৃতীয় ব্যক্তি কে প্রথমে বুঝতে না পারলেও একটু পরে বোঝা গেল। ত্রিপুরার মহারাজা মহিমচন্দ্র দেববর্মা।

মহিমবাবু উভয়কে নমস্কার করে বললেন—আমাকে ডেকেছেন কেন ?

জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন— বোস। আগে তিনজনে জলযোগ করি।

জলযোগ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ বললেন—ব্যক্তিগত বিজ্ঞানের কাজে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহৃত হোক, এ ইচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষের নয়। বন্ধুবরের বিজ্ঞানসাধনা বন্ধ হয়ে গেলে আমার চেয়ে ব্যথিত আর কেউ হবে কি-না জানি না। তবে যেভাবেই হোক বন্ধুর বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করতে দেওয়া হবে না।

মহিমবাবু নীরবে জলযোগ করতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য বিস্ময়ে এবং ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে বন্ধুর কথাগুলো শুনছিলেন।

—বন্ধুর একটি বিজ্ঞানাগার প্রয়োজন। সেজন্যে টাকার দরকার।

—কত টাকা? মহারাজা মহিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

—কম পক্ষে কুড়ি হাজার। রবীন্দ্রনাথ বললেন।

—হুঁ—মহিমচন্দ্র চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। জগদীশচন্দ্র ও অবলা দেবী নীরব। কোন কথা নেই তাঁদের মুখে।

রবীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বললেন—দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা আমি করব, বাকী দশ হাজার টাকা তোমাকে দিতে হবে মহিম।

মহিমচন্দ্র বললেন—যেদিন আপনি আদেশ দেবেন, সেইদিনই টাকার ব্যবস্থা করে দেব।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন—আদেশ নয় ভাই। সেদিন বাকি টাকার জন্যে ত্রিপুরা রাজ-দরবারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হব।

জগদীশচন্দ্র ভাবছেন। চোখের কোণে জলের বিন্দু। বন্ধুবর বর্তমানে দেশে নেই। তিনি থাকলে নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন। অর্থের সাহায্য, ভালবাসার সাহায্য, মমতার সাহায্য, একটা মানুষের চরিত্রের গভীরতা অতলান্ত বলেই সে এত উন্নত, এত মহান, এত পূজনীয়।

চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের সময় যে অর্থ তিনি পেয়েছেন, তা দিয়ে কি একটা বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তোলা যায়? সংসার খরচের জন্যে অবশ্য মাইনে পাবেন কলেজ থেকে। পাঁচ বছরের জন্যে। এমেরিটাস্ প্রফেসর পদের সম্মান পেয়েছেন ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ১৯১৭ সালে ফরিদপুরে শিল্প প্রদর্শনীতে সভাপতির ভাষণ দিয়ে আসেন। ১৯১৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দান করেন।

সবই হল, কিন্তু আসল জিনিসের অভাব। অর্থ কোথায় যে বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে উঠবে?

দুজন বরেণ্য সন্তান এগিয়ে এলেন আচার্য জগদীশের মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যে। প্রথম জন যুগলকিশোর বিড়লা, দ্বিতীয় জন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁদের আর্থিক সাহায্যে গড়ে উঠল প্রাচ্যের বিজ্ঞান বিদ্যালয়, বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসে চিঠি লিখলেন। তার সঙ্গে বন্ধুবরকে একটি কবিতা পাঠালেন। কবিতার নাম আবাহন।

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন। ঊনষাট বছরের জন্মদিন। আপার সারকুলার রোডের পশ্চিম পাড়ে গড়ে উঠেছে বসু বিজ্ঞান-মন্দির। সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানা। উৎসব শুরু হবার অনেক আগে থেকেই সকলেই আসনে উপবিষ্ট। সভামঞ্চে টেবিল চেয়ার।

নির্ধারিত সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র সভাপতিকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। সেদিনের উৎসবে সভাপতি বিশ্ববরেণ্য রসায়নশাস্ত্রবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। দুই বরেণ্য মনীষী সভামঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখালেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আসন গ্রহণ করলেন, তারপর করলেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র আসন গ্রহণ করার পর উপস্থিত সুধিবৃন্দ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

জগদীশচন্দ্র সমবেত দর্শকবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আজ আমাদের মধ্যে বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ নেই। তিনি বিদেশে। আজ তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি, তবু তিনি আমাদের ভোলেন নি। আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি আমাদের একটি চিঠি লিখেছেন এবং আবাহন নাম দিয়ে একটি কবিতা পাঠিয়েছেন। আপনাদের অবগতির জন্যে আগে চিঠি পাঠ করা হচ্ছে। পরিশেষে কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো হবে—।

"তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তাহলে খুব আনন্দ হত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তাহলে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিনে যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকের তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এ তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সংকল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।……

……তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছ এই জন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞান সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করছো। তোমার মন্ত্রের গুণে তোমার তপস্যার বলে দেবী সেই আসনে অচলা হবেন এবং প্রসন্ন দক্ষিণ-হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।" তারপর রবীন্দ্রনাথের পাঠানো কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো হল উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে।

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
　　কর মহোজ্জ্বল আজ হে !
　　শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে !
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি দীক্ষা,
　　যাত্রিদল সব সাজ হে !
　　শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে !
বল, জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
　　জয় তপস্বী রাজ হে !
জয় হে, জয় হে, জয় হে !
এস বজ্র মহাসনে, মাতৃ আশীর্ভাষণে
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে !
　　সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
　　এস দুঃসহ দুঃখ ভাগী,
এস দুর্জয় শক্তি সম্পদ
　　মুক্ত বন্ধ সমাজ হে !
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,—
　　নাশ ভারত লাজ হে !
এস মঙ্গল, এস গৌরব
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
　　এস তেজঃ সূর্য উজ্জ্বল
　　কীর্তি অম্বর মাঝ হে !
বীর ধর্মে পুণ্য কর্মে
　　বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
　　জয় তপস্বী রাজ হে,
জয় হে, জয় হে, জয় হে।

১৪ই অগ্রহায়ণ　　　　　　　　　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩২৪

কবিতা পাঠের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর নিবেদন শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি পংক্তি মানুষের মনে চিরকালের জন্যে অগ্নিশিখার মত প্রজ্বলিত হয়। সেই পংক্তিগুলি অম্লান

অপরিবর্তিত। সেইগুলিই মনে থাকে বরাবরের জন্য: "মানব চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি, মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশ বিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।"

সব শেষে সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের কঠোর জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনের প্রত্যেকটি কথা জনসাধারণের কাছে বললেন। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্র সাহিত্যিক, জগদীশচন্দ্র শিল্পী। বসু বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনা করে তিনি বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ সুগম করে দিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে—এই বিজ্ঞান মন্দির যেন দেশবাসীর বিজ্ঞানের তীর্থস্থানে পরিণত হয়—জগদীশচন্দ্রের এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন সার্থক হয়। বসু বিজ্ঞান-মন্দির যেন ভবিষ্যৎ কালের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

॥ তেরো ॥

বিপুল কীর্তির মন্ত্র

কলকাতার আপার সারকুলার রোডে বসু বিজ্ঞান-মন্দির। দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতে, উলুবেড়িয়ার কাছে সিজবেড়িয়াতে জগদীশচন্দ্রের কীর্তিযজ্ঞ চলেছে আগের মতই। তিনি অনুভব করেছিলেন আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। উন্নত ধরনের কৃষি উৎপাদন করতে না পারলে দেশের লোকের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। উন্নত ধরনের ফসলের সঙ্গে, প্রচুর পরিমাণে ফসল বাড়াতে হবে, আর তার জন্যে চাই উন্নত ধরনের কৃষিক্ষেত্র।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র কুচুরীপানার আবরণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একবার কোন পুকুরে একটি কুচুরীপানার চারা যদি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে দেখতে দেখতে হাজার হাজার কুচুরীপানা ছড়িয়ে পড়বে মাঠে, ঘাটে, পুকুরে। আর কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত পুষ্টি শুষে নিয়ে মাঠকে এমন পুষ্টিহীন করে ফেলে যে সে মাঠের আর কোন খাদ্য প্রস্তুত করার ক্ষমতা থাকে না।

কচুরীপানাকে বিনাশ করার জন্যে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেন, কিন্তু ফল পেলেন না। জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে কুচুরীপানা ধ্বংসের জন্য রিসার্চ শুরু করলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সুচিন্তিত মতামত দান করলেন। তিনি লিখলেন: "এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি উপায়ের কথা মনে হয়—

(১) পানার গায়ে ছত্রাক জাতীয় (Fungal Parasites) পরাসক্ত জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।

(২) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করা।

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা।

(৪) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্ট করা।

জগদীশচন্দ্র ও তাঁর ছাত্ররা একটির পর একটি রিসার্চ করে দেখলেন কচুরীপানায় গরম জল ঢাললে কচুরীপানা মরে যায়। কত গরম ঢালতে হবে? সঠিক গরম না জানলে কুচুরীপানার শেকড় কোন সময়ে মরবে, কোন সময়ে মরবে না। কচুরীপানার জীবনীশক্তি আছে শেকড়ের মধ্যে। ওপর থেকে গরম জল ঢেলে দিলে জলের ওপরের পাতাগুলো সেদ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে সত্য, কিন্তু জলের নীচে শেকড়ের গায়ে উত্তাপ যেতে যেতে জল ঠাণ্ডা

হয়ে যায়। ওপর থেকে পাতাগুলো ঝলসে গেলেও ভেতরের শেকড় জীবন্ত থাকে এবং সেই শেকড় থেকে আবার নতুন কচুরীপানা জন্মায়। সেইজন্যে কচুরীপানার বিনাশ হচ্ছে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ডেথ রেকর্ডার লাগালেন কচুরীপানার গায়ে, তারপর উত্তাপ দিতে শুরু করলেন।

উষ্ণতা বাড়াতে লাগলেন। জলের উষ্ণতা যখন ষাট ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের ওপর উঠল, তখনই দেখা গেল ডেথ রেকর্ডার-এ মৃত্যুরেখার দাগ পড়ছে। প্রথমে পাতা তারপর শিকড়ের মৃত্যু ঘটল। কচুরীপানার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটল। জগদীশচন্দ্র বললেন—ষাট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা একশো চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উত্তাপ কচুরীপানায় দিলে, কচুরীপানা আপনা থেকেই মরে যাবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই উত্তাপ নীচু থেকে দেওয়া দরকার, কারণ পাতার আগে শিকড়গুলিকে ঝলসিয়ে মেরে ফেলা দরকার।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ঘরে ঘরে ভারতীয় আদর্শের অনুপ্রেরণায় গবেষণা চলছে। ভারতীয় সমস্যাকে তুলে ধরে তার সমাধান করাই বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের আদর্শ। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীর দল বিজ্ঞান শিক্ষালাভের জন্য এই বিজ্ঞান মন্দিরে আসতে পারেন, তাঁদের শিক্ষার বিষয় শিখতে পারেন স্বয়ং আচার্যদেবের পদতলে বসে, অথবা তাঁর সহকারীদের কাছে।

একদিন এই ভারতের বুকে যেমন নালন্দা গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ছাত্ররা আসতেন ভারতীয় শিক্ষার উৎকর্ষতা গ্রহণ করতে, ঠিক তেমনি নবভারতে গড়ে উঠল বসু বিজ্ঞান-মন্দির। ভারতবর্ষের তীর্থ-মন্দিরের শিল্পকার্যের অনুকরণে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে আঁকা হল নানা শিল্পচাতুর্য। ভারতবর্ষের এক মনোরম বিজ্ঞা- মন্দির; যে মন্দিরকে বাইরে থেকে দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে, প্রণাম করে ঢুকতে হয়। ভিতরে প্রবেশ করলে এক বিজ্ঞানের গবেষণাগার চোখে পড়ে, যেখানে চলেছে শুধু বিজ্ঞানের পূজা। সমস্যার সমাধান। পৃথিবীতে যত সমস্যার উদ্ভব হবে, বসু বিজ্ঞান-মন্দির বিনা স্বার্থে তার সমাধান করে দেবার জন্যে যুদ্ধ করবে। বসু বিজ্ঞান-মন্দির এ যুগের এক দধিচীর প্রতীক মন্দির। বিনাস্বার্থে অপরের সমস্যার সমাধান করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

কলিকাতা

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

বন্ধু,

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার

জগদীশ

'অব্যক্ত' পুস্তক জগদীশচন্দ্রের বাংলা প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন। কুড়িটি প্রবন্ধ সংকলিত করে পুস্তকটি প্রকাশ করেন অব্যক্ত নামকরণের মধ্যে। অব্যক্ত যখন কবিগুরুর কাছে পাঠিয়ে দেন বিজ্ঞানগুরু. তখন ওপরের চিঠির পংক্তি ক'টি ব্যক্ত করেন। জগদীশচন্দ্রকে সাহিত্যের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে একটি প্রবন্ধই যথেষ্ট। প্রবন্ধের শীর্ষনাম: "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে।"

জীবন-আকাশের সূর্যদেব ক্রমশ পশ্চিম দিগন্তের পথে তাঁর অর্করথ নিয়ে চলেছেন। জগদীশচন্দ্রের জীবনাকাশ শ্রদ্ধা, খ্যাতি, ভালবাসা, প্রীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের রঙে রঙীয়ান। জীবনের সাতরঙ সমস্ত জীবনাকাশকে রঙীন করে তুলেছে; পূজনীয় করে তুলেছে।

দেশবাসীর প্রস্তুতিপর্ব চলল। আচার্যদেবের সত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে নাগরিক পক্ষ থেকে। অসংখ্য শ্রদ্ধাবনত মানুষের সঙ্গে সেদিন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ নীলরতন সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিনের বন্ধুবরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি সেই কবিতাপাঠের মধ্যে দিয়েই উৎসবের সূচনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিতা পাঠ শুরু করলেন:

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
...প্রিয় করকমলেষু—

বন্ধু,
যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু,
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদ শব্দ তরে,
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে. ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিন রজনীর জীবনযাত্রা বিশ্ব ধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনা গান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।

প্রাণের প্রথম বাণী এই মত জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই ; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি' ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা, নির্বাকের অন্তঃপুর হতে,
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
—তরুর মর্মর সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
—হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিতে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্র ভেদী
মর্তের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকার লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিল ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই তোমার পাথেয়,
যে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রা দীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে।

জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে!
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যা ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন
১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে চেনাবার জন্যে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই বলেই পৃথিবীর মানুষের বিশ্বাস।

॥ চোদ্দ ॥

১৯৩৭ সাল।

জগদীশচন্দ্র গিরিডিতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছেন। সঙ্গে লেডী অবলা বসু। ডাঃ নীলরতন সরকার পাঠিয়েছেন আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে। সমস্ত জীবন বিজ্ঞান সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। সমস্যার সমাধান করেছেন। সমাধানের পদ্ধতি সকলের হাতে তুলে দিয়েছেন, পেটেণ্ট করেন নি, অর্থাগমের পথ করেন নি। দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছেন সমাধানের পন্থাগুলি। দেশবাসীর উন্নতি হোক। দেশের মানুষ মানুষ হোক। দেশ স্বাধীন হোক।

জগদীশচন্দ্র ইজি চেয়ারে বসে চোখ বুজে চিন্তা করছেন। কত দিন পার হয়ে গেল জীবনের সঞ্চয় থেকে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন সিস্টার নিবেদিতা, স্যার যদুনাথ সরকার, ওঁদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন রাজগৃহে। সেদিন কি সুন্দরই না লেগেছিল। মনে হয়েছিল আবার ফিরে গেছেন সেই হিন্দু আর বৌদ্ধ সভ্যতার যুগে যখন নালন্দা ছিল জ্ঞানের পীঠস্থান। রাজগৃহের ভগ্ন প্রাসাদের কোণে দাঁড়িয়ে তিনি যেন অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। সে কণ্ঠস্বর কোন সময়ে শীলভদ্র যাজীর, কোন সময়ে মহামতি নাগার্জুনের।

কে যেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। চোখ খুলে আচার্যদেব দেখলেন অবলাদেবী মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মৃদু হেসে আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল ?

না। কিছু নয়।

কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে অবলাদেবী বললেন—তোমার শরীর খারাপ লাগছে ?

—না। এমনি শুয়ে আছি। জীবনের কথা ভাবছি।

অবলাদেবী পাশে মোড়ার ওপর বসে। জগদীশচন্দ্র চোখ বন্ধ করে অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাগুলো ছবির মত জীবনের রূপালী পর্দায় পরপর প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। অতীতের কথা আজ এতবার করে মনে পড়ছে কেন ?

সুভাষ এসে জিজ্ঞাসা করল—প্রফেসর ওটেন আমাদের অপমান করেছেন, আমাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তার প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘট করব। আপনি আমাদের কী উপদেশ দেন ?

—নিশ্চয়ই করবে। পরের আত্মসম্মান যেমন ক্ষুণ্ণ করবে না, নিজের অসম্মানও সহ্য করবে না। তোমরা স্ট্রাইক কর। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

ডি. এল. রায় গান গাইছে। ভারী সুন্দর গান। কিন্তু রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস এদের চরিত-কথা নিয়ে গান করে কেন? বাঙালীকে নিয়ে কি গান লেখা যায় না? বাঙালী কি বেঁচে নেই?

—এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাতে হবে, যাতে আবার এই মুমূর্ষু জাতটা বেঁচে উঠক। সে তার আত্মশক্তি ফিরে পাক। বাঙালীর শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তির উত্তাপ অনুভব করার ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতা আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

ডি. এল. রায কিছুক্ষণ নীরবে হারমোনিয়াম বাজিযে চললেন, তারপর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে দেশাত্মবোধক গানের কলিতে সুর দিলেনঃ

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

—তুমি বাথরুমে যাবে না?

অবলাদেবীর ডাকে চোখ খুললেন আচার্যদেব। হাসলেন একটু। জীবনের লাভ-ক্ষতির খতিয়ান করতে বসেছেন যেন; কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছে না।

—গরম জলের ব্যবস্থা করতে বল।

—করা আছে।

জগদীশচন্দ্র উঠলেন। ধীর পদক্ষেপে বাথরুমে গেলেন। দরজা বন্ধ করলেন।

কত কথা উঁকি মারছে জীবনের আকাশে-বাতাসে। মিশরের পিরামিড যেন এক আশ্চর্য বিজ্ঞানের স্বপ্ন। শেষ বইটার কথা বার বার মনে পড়ছে, খুব আদরের বই ঃ Growth and tropic movements of plants.

ওই তো সুভাষচন্দ্র তাঁকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। মেয়র সুভাষচন্দ্র। কলকাতা করপোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র। ওই তো কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস্‌সি. উপাধি দিচ্ছে—ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় ডি. এস্‌সি. উপাধি দিচ্ছে—কত লোক! লোকে লোকারণ্য! সকলের হাতেই মালা। ফুলের মালা। একের পর এক মালা পরিয়ে যাচ্ছে। ওই তো অবলাদেবী! জগদীশচন্দ্র তাঁকে ঠাট্টা করে যখন বলতেন লেডী বাসু, তখন তিনি ভীষণ লজ্জা পেতেন। তিনি বলতেন—তুমি ভাল কাজ করেছ, স্যার হয়েছ। আমি কেন লেডী হব?

—তুমি অনুপ্রেরণা না দিলে, তুমি সহানুভূতি না দিলে, তুমি সব সময়ে সাহায্য না করলে আমি কোন কাজেই সার্থক হতাম না। আমার জয়-লাভের মধ্যে আছে তোমার ত্যাগ। তাই আমি স্যার আর তুমি আমার অনারেবল লেডী!

•• লেডী অবলা বসুর ফরসা ধবধবে রঙ লজ্জায় লাল হয়ে উঠত।

—অবলা! লেডী অবলা!

জগদীশচন্দ্র ডাকার চেষ্টা করলেন। লক্ষাধিক মানুষ। কত ফুলের মালা। স্নানের টবটা কত দূরে চলে গেছে। সব মানুষের পেছনে চলে গেছে স্নানের টব।

—অবলা—অবলা—জগদীশচন্দ্রের ডাকে সাড়া দিলেন না অবলাদেবী। অনেক লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁর চিরকালের প্রেরণাদায়িনী।—অবলা—অবলা—হাত বাড়িয়ে দিলেন জগদীশচন্দ্র। অবলাদেবীও হাত বাড়ালেন, ওঁর হাত দুটি ধরার জন্যে, কিন্তু পারছেন না। অনেক লোকের ভিড় দু'জনার মাঝখানে।

—আর একটু এগিয়ে এস। ম্লানকণ্ঠে অবলাদেবী বললেন—আমি অত উঁচুতে উঠতে পারছি না।

জগদীশচন্দ্র মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন। নীচে নামার পদক্ষেপে পা বাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ।

শব্দ শুনে লেডী অবলা এবং সকলেই বাথরুমের দরজা খুলে ফেললেন। আচার্যদেবের চেতনাহীন দেহ বাথরুমের মেঝের ওপর পড়ে। তাঁর হাতখানি সামনের দিকে প্রসারিত।

লেডী অবলা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন। সকলে ধরাধরি করে আচার্যদেবের সংজ্ঞাহীন দেহ বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন। একজন ছুটলেন স্থানীয় ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে আনতে।

ডাক্তারবাবু এলেন। পরীক্ষা করলেন। একবার, দুবার বারবার। তারপর বললেন—কোন আশা নেই।

২৩শে নভেম্বর ভারতের আকাশ থেকে বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল।

২৪শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্রের দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল।

মরা মরা বলে এ কাহিনী শুরু করেছিলাম, জানি না রাম উচ্চারণে পৌঁছেছে কিনা। না পৌঁছোলে দোষ রাম নামের নয়, যে রাম নামের বদলে মরা নাম উচ্চারণ করছে তার। রাম নাম চির পুণ্যময় নাম। রাম নাম অমর নাম।

একদিন তো বাংলাদেশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মহামতি পণ্ডিতবর্গের জন্ম হয়েছিল। পরাধীনতার দোহাই দিয়ে আমাদের সান্ত্বনা ছিল সুযোগ না থাকায় আমাদের দেশ থেকে কোন আবিষ্কার হয় নি।

পরাধীন ভারতেই কিন্তু জন্মেছিলেন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর স্বর্গজগতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁদের জন্ম পরাধীন ভারতে, কর্মসাধনাও পরাধীন ভারতে আবার তিরোধানও পরাধীন ভারতে।

পরাধীন ভারতের এত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যে তাঁদের একত্র আহ্বানে, একত্র আলোড়নে, একত্র জ্ঞানে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের কাছে সহজ মনে হলেও প্রত্যেক মনীষীর শেষ রক্তবিন্দু মাতৃ-পূজায় নৈবেদ্যর মত এগিয়ে দিতে হয়েছিল। তারই আশীর্বাদ-স্বরূপ এই স্বাধীনতা! একে তোমরা নষ্ট কোরো না। তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাও। তোমাদের মধ্যেও আবার সৃষ্টি হোক রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র। পত্রে-পত্রে চঞ্চলিত হয়ে উঠুক তোমাদের জীবন-প্রাঙ্গণ!

শেষ